কার্তিক ১৩৮৪

আনন্দমেলা

এই সংখ্যা থেকেই
শুরু হল চুনী গোস্বামীর আত্মকথা
'খেলতে খেলতে'

মাসিক আনন্দমেলার জন্য
পেলের
বিশেষ রচনা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

ব্যাঙ্ক ব্যাপারটা কী?
ব্যাঙ্ নয় বোকা ব্যাঙ্ক, যেখানে টাকা থাকে
চল দেখে আসি
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
কি ব্যাঙ্?
ধ্যেৎ কতকগুলো টিকিটঘর আর কী সব লেখা
দেখলি মহিলার এক গাদা টাকা লোকটা লুকিয়ে ফেললো
চল ঐ ভদ্রলোককে বলি
এই প্রথম ব্যাঙ্কে এলে তাইনা?
হ্যাঁ
কিন্তু মহিলার?
ভয় নেই উনি টাকা জমা রাখলেন

চলবে

আনন্দমেলা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র
বিজ্ঞপ্তি নং ৩৬৯ (১৬) ডি-বি-সি ; তারিখ ১১ জানুয়ারি, ১৯৭৭
কার্তিক ১৩৮৪ অকটোবর ১৯৭৭ তৃতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা
দেড় টাকা

বিশেষ রচনা আনন্দমেলার ছোট্ট বন্ধুদের প্রতি। পেলে ২৪

আত্মকথা খেলতে-খেলতে । চুনী গোস্বামী ১০

গল্প আঠা দিয়ে মুণ্ডু আঁটা । মনোজ বসু ১৩
তুতুনের ঘুমের ওষুধ । শেখর বসু ৩৯

অ্যাডভেঞ্চার উজানগঙ্গায় হিলারি । তাপস গঙ্গোপাধ্যায় ৫

ছড়া বহুরূপী । শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৮

গোয়েন্দা-'কাহিনী' শার্লক হোম্‌স আসলে । অশ্রুকুমার সিকদার ৪৫

উপন্যাস অলৌকিক । বিমল কর ৩৬
বন্ধ ঘরের আওয়াজ । সমরেশ বসু ৪৩

কমিকস গাবলু ৯, ভূতুড়ে গাড়ি ১৯, টারজান ২২
টিনটিন ৩০, নোলেদা ৫৩

খেলাধুলো কলকাতায় কসমস (ছবির পাতা) ২৫
আই এফ এ শীল্ডের কথা ও কাহিনী । মুকুল দত্ত ৪৮
লীগ জিতল ইস্টবেঙ্গল। পুষ্পেন সরকার ৪৯
অস্ট্রেলিয়ার অপ্রত্যাশিত হার । সুব্রত সরকার ৫১

লেখাপড়া নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক কী বলেন ৩২
কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় ৩৩

ধাঁধা-মজা-রহস্য আটখানা ২৮, ধাঁধা ২৮, কিসের ফটো ২৯,
কিসের ছবি ২৯, শব্দ-সন্ধান ২৯

অন্যান্য লেখা তোমাদের পাতা ২১; ডোডো-তাতাই । তারাপদ রায় ৩৮;
বিশ্ববিচিত্রা । দিদিমণি ৪১; মণিমেলার খবর ৪৭;
আঁকো । রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪; শেখো । কারিগর ৫৪

প্রচ্ছদ-চিত্র দেবীপ্রসাদ সিংহের তোলা । 'উজানগঙ্গায় হিলারি' রচনার সঙ্গে ব্যবহৃত রঙিন আলোকচিত্র তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তুলেছেন । 'কলকাতায় কসমস'-এর আলোকচিত্র তুলেছেন বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত।

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডএর পক্ষে বাপাদিত্য রায় কর্তৃক
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে
প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, গি ২৪৮
সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

উজানগঙ্গা-অভিযানের নৌকো

জলের কুমির ডাঙায়

উজান গঙ্গায় হিলারি

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

বিয়াল্লিশ বছর আগের কথা। একদল স্কুলের ছেলে বেড়াতে গিয়েছিল পাহাড়ে—মাউন্ট রুয়াপেহু। নিউজিল্যান্ডের কলকাতা অকল্যানড থেকে খানিক দূরে ওই পাহাড়, বরফে ঢাকা। ওই দলেই ছিল এডমনড, তখন ওর বয়স ষোল, তালগাছের মত লম্বা, ক্লাস টেনে পড়ে।

জীবনে এর আগে কখনো পাহাড় দেখেনি। পাহাড়ে বন্ধুরা সবাই যাবে শুনে ওরও দারুণ শখ হল। কিন্তু যেতে হলে চাঁদা দিতে হবে। কিন্তু পয়সা পাবে কোথায়! নেহাতই গরিব ঘরের ছেলে। বাবা একসময় একটি মফস্বল কাগজের সম্পাদক হলেও তখন পেশায় মৌলি। সুন্দরবনে যারা জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মধু সংগ্রহ করে তাদের বলা হয় মৌলি। এডের বাবা অকল্যানড শহরের আশপাশে চাষীদের ক্ষেতে-খামারে গাছের ডালে মৌচাক বেঁধে মধু সংগ্রহ করতেন। বাড়িতে ছিল ছোটখাট একটা খাটাল —দুধ বিক্রি করে বাড়তি কিছু আয়ের ব্যবস্থা আর কি! ছোট এড মধু ও দুধের ব্যবসায় স্কুলের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য গায়েগতরে সাহায্য করত। কখনো হাতখরচা পায়নি। এবার গিয়ে বলল : পাহাড়ে যাব, স্কুল থেকে নিয়ে যাবে, ওরা চাঁদা চায়, কয়েকটা টাকা দেবেন। বাবা রাজি হলেন। ছেলেও রওনা দিল বন্ধুদের সঙ্গে পাহাড় দেখতে। পাহাড়ে চড়তে। একেবারে চূড়ায়।

হৈ-হৈ করতে করতে ছেলের দল ট্রেনে চড়ে গিয়ে হাজির হল পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট টুরিসট হোটেলে। শীতকাল। চার-দিকে শুধু বরফ আর বরফ। ছোট নদী-নালা সব জমে বরফ। বাতাস নয় যেন ছুরির ফলা। ওই বরফের ওপর দশ দিন ধরে চলল শুধু খেলা আর খেলা। দেখতে দেখতে ছুটি ফুরিয়ে গেল—এবার ঘরে ফেরার পালা। আর তখনই খেয়াল হল এডের—আরে, পাহাড়ে তো ওঠাই হল না। ওঠা তো দূরের কথা, ভাল করে পাহাড়ের চূড়াও তো দেখা হল না।

ওই ঘটনার আঠারো বছর বাদে। ১৯৫৬ সালের ২৯ মে। সেদিনের এড নিজের জীবনকথায় লিখেছেন : "সকাল চারটা। আকাশ পরিষ্কার, মেঘ কুয়াশা কিছু নেই। বহু দূরে নীচে উপত্যকায় থায়াংবক গোম্ফা দেখা যাচ্ছে। স্টোভ জ্বালিয়ে খাবার

তৈরি করে খেয়ে নিলাম। ওই স্টোভের আগুনেই বরফে জমাট পায়ের বুটজোড়া নিলাম সেঁকে। অকসিজেন সেটগুলো পরীক্ষা করে দেখে নিলাম। ঠিক আড়াই ঘণ্টা বাদে রওনা দিলাম। কুঠার দিয়ে বরফের ধাপ কেটে কেটে এগোতে লাগলাম। কখনো হামা-গুড়ি দিয়ে, কখনো বরফের খোদলে কোনরকমে পা রেখে। সকাল সাড়ে এগারোটা—আমি আর তেনজিং দুজনেই এভারেসটের চূড়োয়।"

মাউনট এভারেসট বিজয়ী চৌত্রিশ বছরের সেই যুবকটি আবার ফিরে এসেছেন ভারতে। এখন আর উনি শুধু এড বা এডমনড নন। স্যার এডমনড হিলারি। বয়স আটান্ন। এবার আর এক নতুন অভিযানে মেতে উঠেছিলেন। সমুদ্র-মোহনা থেকে গঙ্গার উৎস পর্যন্ত দু হাজার কিলোমিটার যাবেন জেট বোটে। এই অভিযানের নাম উনি নিজেই রেখেছেন : "সমুদ্র থেকে আকাশ।"

এই অভিযাত্রী দলে আছেন স্যার এডমনডের নিজের দেশের আরো দশজন। ভারতীয় সঙ্গী এখন পর্যন্ত চারজন। কথা আছে হরিদ্বারে আরও দুজন ভারতীয় সঙ্গী যোগ দেবেন। তাছাড়া আছেন দুজন শেরপা—মিঙমা ও পেমা।

গত ২৫ আগসট হলদিয়া থেকে শুরু হয়েছে এই অভিযান। হলদিয়া কলকাতা থেকে একুশ মাইল দূরে হুগলি ও হলদি নদীর মোড়ের মুখে। গঙ্গার মোহনা ওখান থেকে আরও পঁচিশ মাইল দক্ষিণে। যে তিনটি জেট বোটে গঙ্গা নদীর ল্যাজামুড়ো পারা-পার ওঁরা করবেন সেই এয়ার-ইনডিয়া, গঙ্গা ও কিউয়ি নিয়ে হিলারির রওনা হওয়া আগের দিন বোটগুলি কতটা টেঁকসই দেখবার জন্য গিয়েছিলেন সাগরদ্বীপে—একেবারে মোহনায়। ফলে নদীর ল্যাজের দিকের পঁচিশ মাইলও ওরা পার করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাড়তি আরও পাঁচশো কিলোমিটার ওরা ঘুরেছেন সুন্দরবনের নদীনালায়। আর ঘুরতে ঘুরতে ওখানে দেখেছেন নদীর বুকে বাঘের সাঁতার, হেঁতাল বনের ঝোপঝাড়ে বাঘের উঁকি-ঝুঁকি, নদীর পাড়ে কুমিরের ঘুম, জলের ভেতর কুমিরের মাছ-শিকার, গাছের ডালে ডালে হাজার হাজার পাখির মেলা, ধানীঘাসের হাঁটুসমান জঙ্গলে চিতল হরিণের খেলা, আরো কত কী।

যে মানুষ পৃথিবীর ছাদ এভারেস্টে উঠেছেন, যিনি শীতলতম কুমরু পর্বতে মাসভর কাটিয়ে এসেছেন, তিনি কেন এই গঙ্গা অভিযানে নামলেন? প্রশ্নটি স্যার এডমনডকে করেছিল আমাদের জয়ন্ত। সুন্দরবন, সাগরদ্বীপ সব ঘুরে হলদিয়া ছেড়ে গত ৩০ আগস্ট হিলারিরা কলকাতায় এলেন। উঠেছিলেন গ্র্যানড হোটেলে। পয়লা সেপটেমবর আবার উজান ধরে গঙ্গার গভীরে যাবেন। মাঝে শুধু একত্রিশ তারিখটা কাটাবেন কলকাতায়। কাগজে এই খবর পেয়ে জয়ন্ত সোজা ওর বাবার হাত ধরে চলে এল আমার কাছে। ও কাগজ পড়ে। দেখেছে আমি হিলারিদের সঙ্গে ঘুরছি। সোজা এসে বলল ঃ আমি হিলারির সঙ্গে দেখা করতে চাই—ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

বয়স মাত্র তেরো হলে হবে কী, জয়ন্ত সান্যাল রীতিমত দুঃসাহসী। এরই মধ্যে হিমালয় ঘুরে এসেছে। গিয়েছিল গোমুখ রোটাং পাসে। বাবার সঙ্গে।

এ-সব কথা শুনে তো স্যার এডমনড দারুণ খুশী। বললেনঃ বল তোমার কী প্রশ্ন? চটপট একটা রুলটানা খাতা এগিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বলল ঃ প্রশ্নগুলো খাতায় লিখে এনেছি। খাতাটা টেনে নিয়ে হিলারি পাতার পর পাতা উলটে চললেন, পড়তে পড়তে জবাবও লিখে দিলেন প্রতিটি প্রশ্নের।

গঙ্গা অভিযানে নামার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্যার এডমনড লিখলেন, দারুণ রোমাঞ্চকর এই অভিযানে ভারতবাসীদের খুব কাছ থেকে জানার সুযোগ পাব। আর একটি প্রশ্নের জবাবে লিখলেন, এই পবিত্র নদী হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রবহমাণ। তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে লিখলেন, উৎসমুখে বদ্রীনাথের পথে এগোবো কারণ আমাদের বলা হয়েছে, গঙ্গার অনেকগুলি ধারার ওটি অন্যতম। জয়ন্ত জানতে চেয়েছিল, উত্তরকাশী, হরষিল, গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখ পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গার চিরাচরিত রাস্তা দিয়ে না গিয়ে কেন হিলারিরা বদ্রীনাথের পথ বেছে নিয়েছেন? জয়ন্তর চতুর্থ প্রশ্নের জবাবে স্যার এডমনড লিখলেন ঃ এদেশের কর্তারা আমাদের বলেছেন গঙ্গার উৎস একাধিক—তাঁদের কথা আমরা মেনে নিয়েছি। ওর আর একটি প্রশ্নের জবাবে উনি লিখলেন ঃ ছোট ছেলেমেয়েদের রোমাঞ্চকর অভিযানে সবর্দাই উৎসাহ দেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে সঠিক পরামর্শ নেতৃত্ব পথ-প্রদর্শন ও সামান্য টাকাকড়ি দিয়েও সাহায্য করা উচিত। আর একটি প্রশ্নের জবাবে হিলারির উত্তর ঃ আমার দলের বন্ধুরা সবাই যোগ্য, সবাই খুশি।

হিলারির বন্ধুদের একজন হলেন জন হ্যামিলটন। ওই জেট-বোট কোমপানির মালিক। জনের বাবা নিজে এই বোট পৃথিবীতে প্রথম বানান। বোট চলে জেট পদ্ধতিতে। সামনের জল শুষে নিয়ে বোটের পেছন দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুড়ে দিয়ে প্রচণ্ড গতির সৃষ্টি করে। এক একটা বোট পনেরো ফুট লম্বা, ছ ফুট চওড়া। দুশ ঘোড়ার বল ওই বোটের। ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল পর্যন্ত ছুটতে পারে, অথচ বেশ হালকা। দু তিনজন মানুষ অনায়াসে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। ডোবে না, আবার ভাঙবেও না—ফাইবার গ্লাস দিয়ে বানানো বোট।

নিজের চোখে সুন্দরবনে দেখেছি ওই বোটের আশ্চর্য সব খেলা। সুন্দরবনে বিদ্যা, ঠাকুরাইন, আতলা, ঝিলা, গোসাবার মত সব পেল্লায় পেল্লায় নদীতে আমাদের কলকাতার টালির নালার মত অসংখ্য খাড়ি রয়েছে। ভাটার সময় খাড়িগুলি শুকিয়ে যায়, নদীর জলও খানিক নেমে যায় সাগরে। তখন নদীর পাড়ে ও জঙ্গলের মাঝে খানিকটা জায়গা সমুদ্র সৈকতের মত পড়ে থাকে। বালির বদলে পলিমাটি! একেবারে যেন নিকোনো উঠোন।

কর্মসংস্থান
ও প্রশিক্ষণ সুবর্ণ সুযোগ

পত্র বিনিময় মারফত ও 'এনইসি-এর ফ্যাক্টরিতে টি ভি, টেপ রেকর্ডার, রেডিও ও ট্রানজিস্টর এঞ্জিনীয়ার্স ট্রেনিং'এর জন্য ভারতের সমস্ত রাজ্য হইতে ম্যাট্রিক ও তদূর্ধ্ব তরুণ-তরুণী চাই। ট্রেনিং সাফল্যের সহিত সমাপনের পর ন্যাশনাল ইলেকট্রনিকস করপোরেশন কর্তৃক তাঁহাদের অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারিং, মার্কেটিং, সার্ভিসিং অ্যান্ড এক্সপোর্ট প্রোগ্রাম অধীনে তাঁহাদিগকে 'এনইসি' ফ্যাক্টরিতে মাসিক ২৫০ টাকা হইতে ১০০০ টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিকে অথবা নিজ নিজ রাজ্যের গ্রাম বা শহরাঞ্চলে সেলস অফিসার-কাম-এঞ্জিনীয়ার হিসাবে মাসিক ৫০০ টাকা পারিশ্রমিক + কমিশনে নিয়োগ করা হইবে।

ইংরেজি ও হিন্দিতে ট্রেনিং'এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিস্তারিত প্রসপেক্টাস ও ইংরেজি বা হিন্দি ভর্তি ফরমের জন্য মনিঅর্ডারযোগে ৪ টাকা পাঠাইবেন। **কেবল ইংরেজি বা হিন্দিতে চিঠিপত্র লিখিবেন।**

ন্যাশনাল ইলেকট্রনিকস করপোরেশন (রেজিঃ)

এ-৩০ (বিশাল সিনেমার বিপরীতে) বিশাল এনক্লেভ, নয়াদিল্লি-১১০০২৭

পাড় ঘেঁষে বোট চালাতে চালাতে যেই সামনে একটা শুকনো খাড়ি পড়ল—পনেরো কি বিশ ফুট চওড়া খাত—অমনি জন দিল বোট স্লো করে। পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থমকে গিয়ে বোট ক'টা যেন নদীর জলের পারশে মাছের মত ছিটকে উঠল আকাশে। প্রায় তিন চার হাত শূন্যে। তীরবেগে বাতাস কেটে বিশ ফুট চওড়া খাড়ি মুহূর্তে পার হয়ে গিয়ে পড়ল ওপারের জলভেজা চড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ওই স্পিডের মাথায় বোট ঘুরিয়ে নেওয়া হল জলে। অথচ একটা আঁচড় পড়ল না বোটের কোথাও। দেখবার মত খেলা। দেখতে দেখতে বুক কেঁপে ওঠে, অথচ স্যার এডমন্ড তখন প্রাণখুলে শুধু হাসেন।

কারণ এ খেলা ওঁরা এর আগেও খেলেছেন। কোথায়? বহু বছর আগে এই জেট বোট নিয়ে জনের বাবা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সেই বিখ্যাত নদী কলোরাডোর গিরিখাত পার হয়েছিলেন। আজ থেকে ন বছর আগে এই বোট নিয়েই স্যার এডমনড শোন-কুশীর মত পাগলা পাহাড়ী নদীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দাবড়ে বেড়িয়েছিলেন। নেপালের নদী শোন-কুশী। আড়াই শো মাইল লম্বা। প্রতি এক মাইল অন্তর নদীর বুকে ছোট জলপ্রপাত। এভারেসট জয়ের পর থেকে হিমালয়কে ভালবেসে ফেলেছেন হিলারি। ওখানে নেপালে শেরপাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল বানিয়েছেন, হাসপাতাল গড়েছেন। যত অভিযান করেন তার একটা উদ্দেশ্য ওই দরিদ্র নেপালীদের স্কুল-হাসপাতালের খরচ তোলার জন্য টাকা জোগাড় করা। যত কাজেই ব্যস্ত থাকুন প্রত্যেক বছর একবার নেপালে যাবেনই যাবেন।

নেপালে অজস্র নদী। কিন্তু সবই পাহাড়ী এবং পাগলা। নৌকা করে যে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মাল নিয়ে যাবে তারও উপায় নেই। তখনই হিলারির মাথায় খেলে গেল সেই আইডিয়া—জেট বোটে কি এই সব নদী পারাপার সম্ভব নয়?

কিন্তু কে করবে? একটা জেট বোটের দামও কি কম! আমাদের টাকায় কম করেও আশি হাজার টাকা। পেটরোল খরচও প্রচণ্ড। তাছাড়া একজন কেউ সাহস করে পথ না দেখিয়ে দিলে, অন্যরা যে এগিয়ে যেতে চায় না। তাই ঠিক করলেন নিজেই পথ দেখাবেন। স্বদেশে নিজের বন্ধু জনের সঙ্গে কথা বললেন। জন রাজি। সঙ্গে সঙ্গে দুখানা জেট বোট দিলেন। ওরা ভারত-নেপাল সীমান্তে বিরাটনগর থেকে রওনা দিলেন। সঙ্গী জন ছাড়াও ডঃ মাইকেল গিল, ডাঃ ম্যাকস পারল, ডঃ জিম উইলসন আর মিঙমা।

দুটি বোটের একটির নাম শেরপা, অন্যটির কিউয়ি। জলের তোড়ে কিউয়ি চুরমার হয়ে গেল স্যার এডমনডের চোখের সামনে। মরতে মরতে বেঁচে গেলেন গিল, পারল, উইলসন ও মিঙমা। তবু ছাড়ার পাত্র নন হিলারি। জলপ্রপাত, বড় বড় পাথরের চাঁই-এর সঙ্গে পাঞ্জা কষে শেষ পর্যন্ত আড়াইশো মাইল পাড়ি দিয়ে হাজির হলেন নেপালের রাজধানী কাঠমানডুতে—দেখিয়ে দিলেন মনের জোর থাকলে সব করা যায়।

মনের জোরের মত ওর গায়ের জোরও প্রচণ্ড। এই আটান্ন বছর বয়সেও। ছ ফুট দু ইনচি লম্বা, চুয়াল্লিশ ইনচি বুকের ছাতি, কোমর চৌত্রিশ ইনচি, ওজন পঁচানব্বই কিলো। অনেক বছর আগের কথা। তখনো এডমনড স্যার এডমনড নন, এভারেস্ট জয় করেননি। ১৯৫১ সাল। দেশের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব অনেক চেষ্টা চরিত্র করে কিছু টাকা জোগাড় করে হিমালয়ে এসেছেন। সেই প্রথম ওঁর হিমালয় দর্শন। যাচ্ছেন তেইশ হাজার ফুট মুকুট শৃঙ্গের চূড়ায় মুকুট পরাতে। সঙ্গে জনাত্রিশেক শেরপা কুলি। হিলারিরা যা নির্দেশ দেন তা অক্ষরে অক্ষরে ওরা মানতে নারাজ। বিশেষ করে ওদের নেতা শেরপাটি রীতিমত ফন্দিবাজ। নেতাটির সাইজও রীতিমত বিশাল। হিলারি লক্ষ করলেন রোজই তাঁকে নিয়ে ওই শেরপা নেতাটি

এমন কিছু নিজের ভাষায় দেশোয়ালীদের বলে যাতে বাকি সবাই হেসে কুটিপাটি যায়। দিনের পর দিন এভাবেই চলছে। কী করবেন, ওরা মাত্র চারজন, আর শেরপারা ত্রিশজন। কিন্তু একদিন আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না—ছুটে গিয়ে ওই ত্রিশজনের সামনে ওই নেতা-শেরপাটিকে জামার কলার ধরে শূন্যে তুলে ধরলেন। এরপর সবাই ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হাসি-ঠাট্টাও। সেই সঙ্গে হিলারী নিজেও। গ্লানিতে মন ভরে গেল—ছি ছি এ কি করলেন, ওই গরিব শেরপার গায়ে তিনি হাত দিলেন। এর জন্য নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করেননি হিলারি।

ছেলেবেলায় একবার ওর বাবা ওকে চাবুক-পেটা করেছিলেন। হিলারির বাবা ছিলেন অত্যন্ত একরোখা মানুষ। সত্যবাদী। একবার তাঁর ধারণা হল হিলারি নিশ্চয় বাগানের আঙুরলতা থেকে একগুচ্ছ আঙুর খেয়েছেন। স্বীকার করলে যে বাবা কিছুই বলবেন না, তা হিলারি জানতেন, কিন্তু যে কাজ করেননি তা কী করে কবুল করেন। চাবুক চালাতে চালাতে বাবা ঘেমে নেয়ে উঠলেন, হিলারির সর্বাঙ্গ রক্তে ভেসে গেল, কিন্তু টুঁ শব্দটিও করেননি, প্রতিবাদও না। বাবাকে এর জন্য কোনদিনও অসম্মান করেননি।

হিলারির ঠাকুর্দা আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে গিয়েছেন। সেই ভবঘুরে মানুষটির পেশা ছিল ঘড়ি সারানো। গত শতাব্দীতে উনি এদেশে কয়েক বছর ছিলেন। বিভিন্ন দেশীয় রাজা মহারাজার ঘড়ি বানানো এবং মেরামত করা ছিল ওঁর কাজ।

কে জানে পূর্বপুরুষের সেই স্মৃতির টানে বার বার এদেশে ফিরে আসেন কিনা হিলারি। যেমন এবারও এসেছেন। সঙ্গে এবার সঙ্গী সেই শোন-কুশী অভিযানের জন, জিম, মিঙমা, ম্যাক্স ও গিল। তাছাড়া আছেন জনের ছেলে মাইক, আরও আছেন ডিঙ্গল, মারে, জোনস, ডিলন, ওয়ারউইক, অ্যাট-ওয়েল। আর আছেন হিলারির একমাত্র জীবিত সন্তান পিটার। বছর কয়েক আগে এক দুর্ঘটনায় হিলারির স্ত্রী লুইজে ও মেয়ে সেরা মারা গিয়েছেন।

অত বড় পারিবারিক দুর্ঘটনার পর অন্য কোন মানুষ হলে হয়তো জবুথবু হয়ে পড়তেন। কিন্তু হিলারি ভেঙে পড়েননি। ব্যক্তিগত দুঃখ কখনো কাউকে জানতে দিতে চান না। জীবনের ৭

বহুরূপী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বহুরূপীর বহুৎ রং
কেউ বলেছে জবড়জং
কেউ বলেছেন ঐকিক
কাঠের পিঁড়ি চৌকি
কেউ বলেছে গন্না—
খাঁদা ও রামসন্না
ওর কথা কে জানতো
না শোনালে কান্ত?

বহুরূপীর রূপের বাড়
কেউ বলেছে নদীর পাড়
কেউ বলেছে ঝর্না
সে আমাদের পর্ণা।
কেউ বলেছে লম্বায়
ও ঠিক জগদম্বা
কেউ বলেছে ছীঃ ছিঃ
রূপ নাকি? ও বিশ্রী
কেউ বলেছেন লক্ষ্মী
কাক্কাতুয়া পক্ষী।

ছবি সুনীল শীল

ব্রত, যে কাজ কেউ পারে না সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া। দুঃখীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা। এর জন্য কম আঘাত পাননি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অজস্র অভিযানে অংশ নিয়ে নিজের চোখে দেখেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কী ভীষণ দুঃখী। কত লোক না খেতে পেয়ে মরে যায়। তাই একবার খেপে গিয়ে নিজের দেশের সরকারকে বলে বসেছিলেন : লজ্জা করে না, নিজেরা খেতে-পরতে পাও বলে অন্য দেশের দুঃখীদের জন্য কখনো কিছু কর না। হিলারির ওই মন্তব্য নিউজিল্যানডের সব কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। পড়ে তো নিউজিল্যানডের গভর্নমেণ্ট চটেমটে লাল। ওদেশের অর্থমন্ত্রী পালটা জবাব দিলেন : আমি যতখানি পাহাড়ে চড়া বুঝি, হিলারিও ঠিক তত-খানিই বোঝেন অর্থনীতি।

এই বেঁকা মন্তব্যেও কিন্তু হিলারি দমেননি. গায়ে গতরে খেটে, বছরের পর বছর আমেরিকা ও কানাডার বড় বড় কোম্পানি, যারা বিভিন্ন অভিযানে তাঁবু ও অন্যান্য মালপত্র সর-বরাহ করে, তাদের পরামর্শ দিয়ে, বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে যা রোজগার করেন তার একটা বড় অংশ পাঠিয়ে দেন নেপালে। শেরপাদের স্কুল ও হাসপাতাল চালানোর খরচ মেটে সে টাকায়।

সেই এভারেস্ট জয়ের পর থেকে গত পঁচিশ বছর ধরে উনি খ্যাতির শীর্ষে। সবাই ওঁকে চায়, ওঁর কথা শুনতে চায়। কিন্তু কোন হৈ-চৈ ওর ভাল লাগে না। তাই অকল্যানড শহর থেকে দূরে সমুদ্রপাড়ে একটা ছোট কুটির বানিয়ে নিয়েছেন। অবসর সময় কাটে সেই কুটিরেই। পাছে কেউ বিরক্ত করে তাই টেলি-ফোন পর্যন্ত রাখেননি। রীতিমত গম্ভীর। নিঃসঙ্গ। কম খান, কম কথা বলেন, খাটেন অসুরের মত। কোমরে সর্বদা একটা খাপেভরা ছুরি। জানতে চেয়েছিলাম—এটা কি এভারেস্ট অথবা কুমেরু অভিযানের কোন স্মৃতিচিহ্ন? হেসে বললেন : আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নই। বিশ্বাস করি নিজের কাজের শক্তিকে। ছুরিটা নতুন। দেখতেই পাচ্ছ, জেটবোটগুলি বাঁধা-ছাদার জন্য দড়িদড়া লাগে। ওই দড়ি কাটার জন্যই এই ছুরি।

প্রথম যিনি পৃথিবীর ছাদে তেনজিংয়ের সঙ্গে উঠে গোটা বিশ্বকে দেখেছিলেন পায়ের তলায়, তাঁকেই দেখলাম সুন্দরবনে বাঘ দেখে পাঁচ বছরের শিশুর মত আহ্লাদে মেতে উঠতে।

সেদিন ছিল ২৭ আগসট। সুন্দরবনে এবং অভিযানেরও তৃতীয় দিন। ন বেঁকির খাল ছেড়ে আমরা ঢুকছি সমুদ্রের মত চওড়া বিদ্যা নদীতে। লনচে লানচ প্রস্তুত। সবাই একসঙ্গে খেতে বসব। এমন সময় লস্কর কুশাসন মণ্ডল বলে উঠল : স্যার, বাঘ! বাঘ!

বাস খাওয়া উঠল মাথায়। লনচ থেকে লাফ দিয়ে জিম উইলসনকে সঙ্গে নিয়ে হিলারি পড়লেন গঙ্গা বোটের কোলে। জল তোলপাড় করে ছুটে চললেন, বাঘের দিকে। এদিকে বাঘ মশাই চুপিসাড়ে সাঁতার কেটে নদী পাড় হতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বোটের গর্জন শুনে আর জলের তোলপাড়ে অস্থির হয়ে মুখ ঘুরিয়ে পাড়ে উঠে দিলেন জঙ্গলে গা ঢাকা। সঙ্গী বাঘিনী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। তিনিও হেঁতাল-গরজন-গেঁউয়া-গরানের আবডালে গা লুকোলেন। এই লুকোচুরি খেলা চলল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে। বেশ কয়েক হাজার ফুট ছবিও হিলারিরা তুললেন। তারপর সন্ধ্যা-বেলা নির্জন নদীর বুকে, পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়, লনচের ডেকে বসে চা খেতে খেতে বললেন : শুরুতেই যখন দুর্লভ বাঘ দেখেছি তখন আমাদের যাত্রা নিশ্চয় শুভ হবে। এই কটি কথা শুনে মনে হল, আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃসাহসী অভিযাত্রীও তাহলে সংস্কারমুক্ত নন। রসিকতায় মোড়া হলেও ওই কটি কথাতে বিশ্বাসের ছোঁয়াটুকুও ছিল। ছেলেবেলা থেকেই মানুষটি দারুণ ধর্মভীরু!

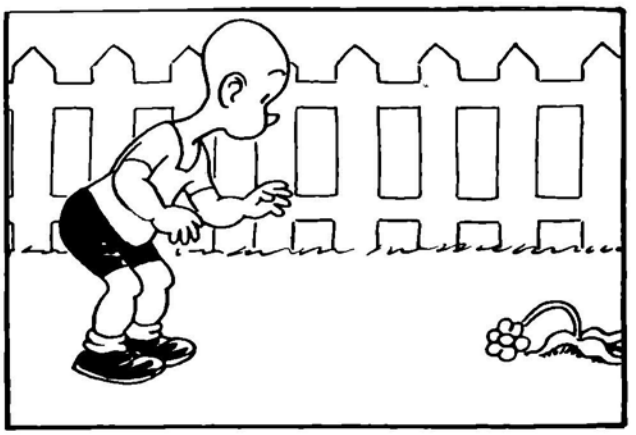

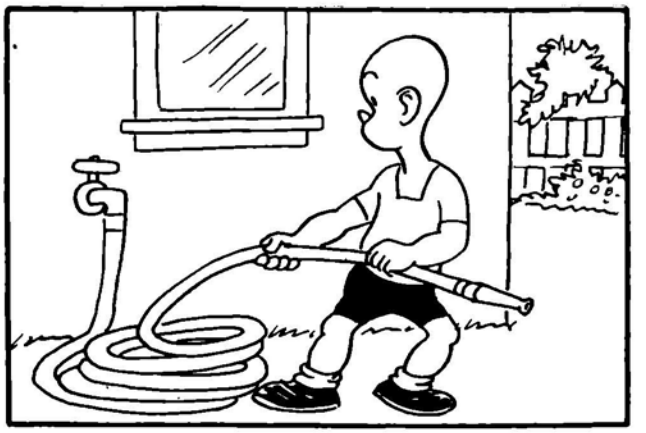

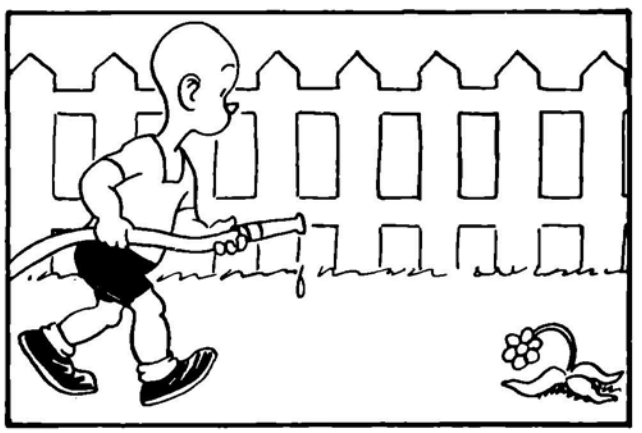

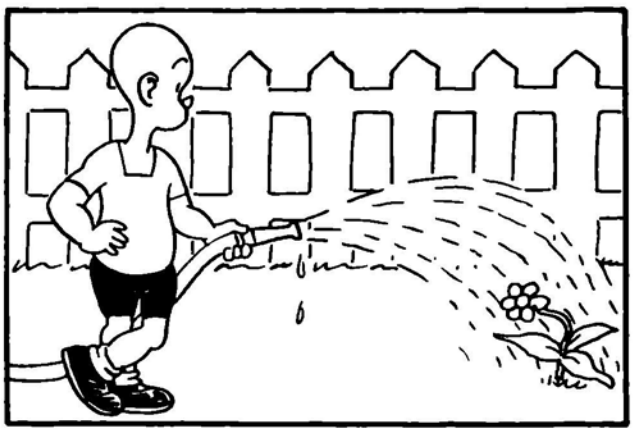

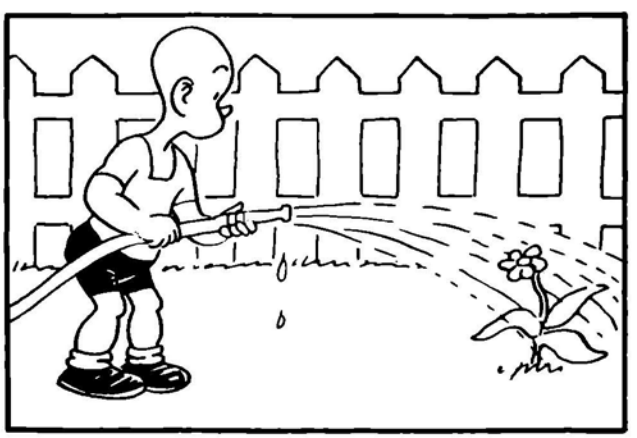

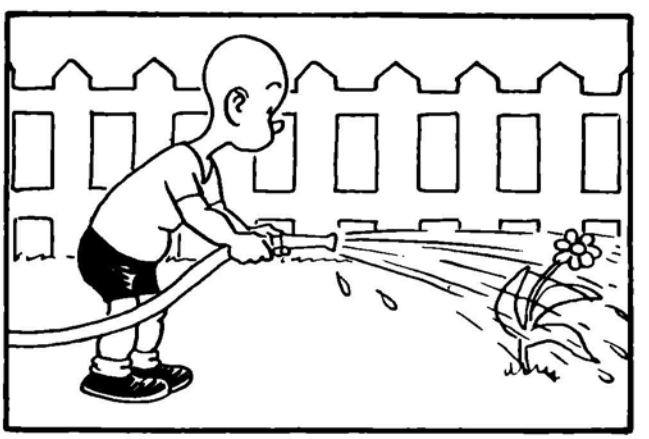

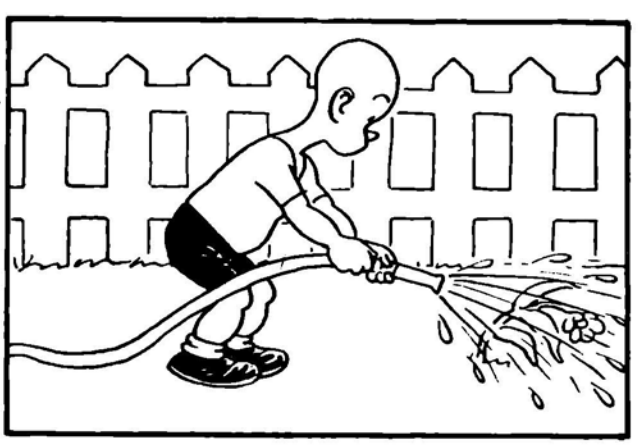

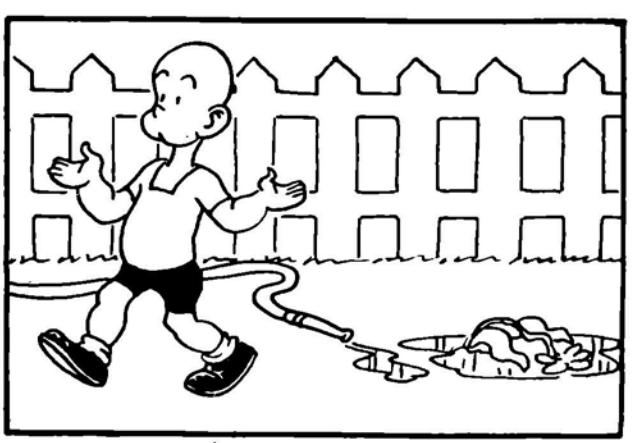

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

ব্লেজার গায়ে গলিয়েই লাফিয়ে উঠল রামবাহাদুর আর থঙ্গরাজ।

কী? কী ব্যাপার?

প্রশ্নের আর উত্তর দেওয়ার দরকার হল না। হো-হো করে হেসে উঠল সবাই। হাসতে হাসতে কারও চোখে জল এল, কারও পেটে ব্যথা হল, কারও গলা ভাঙার জোগাড় হল, কিন্তু হাসি আর থামে না। যাদের নিয়ে এত হাসি—সেই রামবাহাদুর আর থঙ্গরাজও কিছুক্ষণ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকার পরে হাসতে শুরু করে দিল।

রাম বাহাদুরের গায়ে ব্লেজার, ওয়েল ফিট, কিন্তু হাত দুটো নেমে গেছে প্রায় পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত। ওদিকে থঙ্গরাজের বুকে, পিঠে ব্লেজারটা মানিয়েছে চমৎকার, কিন্তু হাত দুটো উঠে গেছে কনুইয়ের ওপরে। ছোট্টখাট্ট রামবাহাদুর আর দৈত্যাকৃতি থঙ্গরাজের হাতা বদল মারাত্মক ব্যাপার!

আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানো, চতুর্থ এশিয়ান গেমসের জন্য নির্বাচিত সব প্রতিযোগীর ব্লেজারের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল দিল্লির এক নামকরা দর্জির দোকানে। সবার গায়ের মাপ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এখান থেকে। চমৎকার ফিটিংস, শুধু সামান্য একটা ভুল। সেই রাতেই অবশ্য কলকাতার দর্জিকে দিয়ে এই ভুল শুধরে নিয়েছিলাম আমরা। নিজের নিজের হাতা ফেরত পেয়ে খুব খুশি রামবাহাদুর আর থঙ্গরাজ।

জাকার্তায় সোনার মেডেল

কবেকার কথা, কিন্তু পেছন দিকে তাকালে এই রকম টুকরো টুকরো সব স্মৃতি ভেসে ওঠে। কত মজার ঘটনা, তবে সব ঘটনাই মজার নয়, দুঃখ-হতাশাও আছে বিস্তর। নিজের কথা লিখতে গিয়ে কত কথা ভিড় করে আসছে একসঙ্গে, সব কিছু গুছিয়ে লেখা সত্যিই খুব কঠিন।

খেলা ছেড়ে দেওয়ার পরে মাঝেমধ্যে কিছু লিখেছি বটে, কিন্তু হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি কাজটা কী শক্ত! অনেক সময় মনে হয়েছে, এর চেয়ে খেলা অনেক সহজ। খেলার সময় ভাবনা-চিন্তার অবকাশ ঘটেনি। বল পেয়েই কাজ শুরু করে দিয়েছি। হয় কাউকে কাটিয়ে সতীর্থের কাছে বল পাস করেছি, না হয় শট করেছি গোল লক্ষ করে। কিংবা মেরেছি কায়দা করে একটি ভলি। তার আগে কেউ বলটা কেড়ে নিলে কাজ তো ফুরিয়েই গেল! কিন্তু আমার এই স্মৃতিকথা লেখার সময় কলমটা তো কেউ কেড়ে নেবে না। পরীক্ষা-হলের নজরদারের মতো কেউ তো বলবেন না—'স্টপ রাইটিং, টাইম ইজ ওভার'।

একদিন আমার দশ বছরের ছেলে সুতীর্থ একটি নামী সাপ্তাহিক পত্রিকা চোখের সামনে মেলে ধরে বলল, 'বাবা এই দেখো তোমার আর একটা ছবি। এ ছবি আগে তো দেখিনি।'

আমার খেলোয়াড় জীবনের অজস্র ছবির মধ্যে ওই ছবিখানি আমার সংগ্রহে নেই। ১৯৬২ সালে জাকার্তা এশিয়ান গেমসের ফুটবল ফাইনাল জয়ের পরের ছবি। আমি বিজয় মঞ্চে দাঁড়িয়ে, ইন্দোনেশিয়ার একটি সুন্দরী মেয়ে আমার গলায় সোনার পদক পরিয়ে দিচ্ছে। সুতীর্থ বলল, 'বাবা, কে গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে?'

বললাম, 'মালা নয়, সোনার মেডেল।' সুতীর্থের মা আমার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে চা আনতে চলে গেল। আমি পেয়ে গেলাম লেখা শুরু করার একটা জায়গা।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতের যত অভিযান, যত খেলা—বিশেষজ্ঞদের মতে, তার মধ্যে ১৯৬০-এর রোম অলিম্পিকে আমরা সবচেয়ে ভাল খেলেছিলাম। রোমের পরে জাকার্তা এশিয়ান গেমস। সুতরাং সম্মান এবং গৌরব ধরে রাখার একটা বড় দায়িত্ব ছিল। দায়িত্বের ঝুঁকিটাও পড়েছিল আমার উপর। কলকাতা ও হায়দরাবাদে কোচিং ক্যাম্প পরিচালনার পরে যখন দল গড়া হল, কাগজে দেখলাম—আমাকে অধিনায়ক করা হয়েছে। দেখলাম, রোম অলিম্পিকের দলই প্রায় পেয়ে গেছি। শুধু পরিবর্তন হয়েছে দু-জন খেলোয়াড়ের। কেম্পিয়া ও লতিফের বদলে দলে এসেছে ফ্রাঙ্কো ও ত্রিলোক সিং।

প্রথমে যে চিন্তাটা আমার মাথায় এল তা হচ্ছে—অধিনায়ক না হওয়ায় প্রদীপ ব্যানার্জী কি একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন? পি কে আমার সিনিয়র এবং রোমে তো ওই ছিল অধিনায়ক। আমার চেয়ে সিনিয়র আরও তিন-চার জন দলে ছিলেন এবং তখন থঙ্গরাজ, বলরাম, জারনেল সিং, অরুণ ঘোষ—কারও প্রতিষ্ঠাই কম ছিল না। সবাই নামকরা খেলোয়াড়। এই খেলোয়াড়দের এক সূত্রে বেঁধে ভাল ফল পাওয়ার আশা করেছিলাম বার বার।

পি কে আমাকে অভিনন্দন জানাতেই মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। দেখলাম, না, ওর মনে কোন ক্ষোভ নেই। বরং আমি অধিনায়ক হয়েছি বলে খুবই খুশি হয়েছিল পি কে।

আমাদের দল ছিল: **গোল**—পি থঙ্গরাজ (বাংলা) ও পি বর্মণ (রেলওয়েজ); **ব্যাক**—চন্দ্রশেখর (মহারাষ্ট্র), জারনেল সিং (বাংলা), অরুণ ঘোষ (বাংলা) ও ত্রিলোক সিং (সার্ভিসেস); **হাফ ব্যাক**—ফ্রাঙ্কো (মহারাষ্ট্র), পি সিংহ (রেলওয়েজ), ইউসুফ খাঁ (অনধ্র) ও রামবাহাদুর (বাংলা); **ফরোয়ার্ড**—পি কে ব্যানার্জী (রেলওয়েজ), আফজল (অনধ্র), বলরাম (বাংলা), চুনী গোস্বামী অধিনায়ক (বাংলা), অরুময় (বাংলা), এথিরাজ (সার্ভিসেস)।

কোচ ছিলেন পরলোকগত রহিম সাহেব, যাঁর ফুটবল-প্রজ্ঞা সর্বজনস্বীকৃত। এখানে বলা প্রয়োজন, হায়দরাবাদের নাইম তখন উঠতি খেলোয়াড়। দারুণ খেলছে। তাকেও দলে নেওয়ার কথা উঠেছিল, একটুর জন্যে হয়নি। আমাদের দলে ইস্টার্ন রেলের তিন 'পি' প্রদ্যোত-প্রশান্ত-প্রদীপ ছিল যেন ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন 'ডবলিউ' ওরেল-উইকস-ওয়ালকটের মতো উজ্জ্বল ত্রিমূর্তি। তিন 'পি' নিয়ে আমার একটু গর্বও ছিল। তিনজনই তখন চমৎকার ফর্মে ছিল।

জাকার্তা যাত্রার কয়েকদিন আগে হায়দরাবাদে আমাদের সঙ্গে এক প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করল সেকেন্দ্রাবাদ রেলওয়ে ক্লাব। যেদিন খেলা হয়েছিল সে দিনটি ছিল রহিম সাহেবের

জন্ম তারিখ। সম্ভবত অনধ্রপ্রদেশ ফুটবলের নব রূপকার রহিম সাহেবের সম্মানে ওই খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ সম্মিলিত দলের বিরুদ্ধে ওই ম্যাচে প্রথমে আমি মাঠে নামিনি। কিন্তু কী দুর্দৈব, আমাদের তারকা-খচিত দল বিরতি সময়ের মধ্যে ০—২ গোলে পিছিয়ে পড়ল। রহিম সাহেব ছুটে এলেন আর্মার কাছে। বললেন, 'চুনী, এ কী ব্যাপার! জাকার্তা যাত্রার আগেই দলটি যদি হেরে বসে থাকে তবে সাধারণের চোখে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে না? চাপ পড়বে না তোমাদের মনের উপর? শিগগির জার্সি পরে মাঠে নামো।'

কোচের আদেশ। মাঠে নামতেই হল। দ্বিতীয়ার্ধে দুটি গোল শোধ করার পর আমি যখন তৃতীয় গোল করে হ্যাটট্রিক করলাম, রহিম সাহেব ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি জানতাম। অনেকদিন তুমি আমার সঙ্গে আছ, আমি জানি এখন তোমার দারুণ ফর্ম। যে-কোনো ম্যাচের ভাগ্য তুমি গড়ে দিতে পার, যদি ঠিকভাবে খেল।'

কোচের কথায় স্বভাবতই আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। আমার আত্মবিশ্বাসও বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মর্মে মর্মে এটাও অনুভব করছিলাম, সামনে কঠিন পরীক্ষা। এশিয়ার ছোট-ছোট দেশের কাছেও ফুটবল আর ঘুম-পাড়ানি গান নয়। নবজাগ্রত ফুটবল-শক্তির বিরুদ্ধে ম্যানিলা এবং টোকিও এশিয়াডে আমাদের ব্যর্থতার কথাও মনে ছিল।

এদিকে জাকার্তা যাত্রার দিন এগিয়ে আসছে। ঠিক ছিল হকি, অ্যাথলেটিকস, বকসিং, কুস্তি প্রভৃতি দল যাত্রা করবে দিল্লি থেকে। ফুটবল দল কলকাতা থেকে। কলকাতায় সমাগত ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে আমরা এক সুখী পরিবার গড়ে তুলেছি। চুটিয়ে প্র্যাক্টিস ও ফিজিক্যাল ট্রেনিং করছি। একদিন দেখা গেল থঙ্গরাজের জুতো ছিঁড়ে গেছে। খেলার বুট নয়, ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের কেডস সু। জুতো কেনার জন্যে থঙ্গরাজকে নিয়ে দোকানে ছুটলাম।

আজ লিখতে হাসি পাচ্ছে, তোমরাও হয়তো পড়ে হাসবে, কিন্তু সেদিন আমাদের ভাবনার অন্ত ছিল না। থঙ্গরাজকে হয়ত তোমরা অনেকেই দেখেছ। দেখেছ তো মানুষটা কত বড়। ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা বিরাট পুরুষ। গালিভার্স ট্রাভেলের গল্পের লিলিপুটদের মতো না হলেও ওর পাশে আমাদের বেশ ছোট দেখায়। দেহের অনুপাতে ওর পা দুখানা যেন আরও বড়।

থঙ্গরাজ ও রাম বাহাদুর

দমদম থেকে বিমানে উঠবার আগে

একজন তো আমাকে জাকার্তায় জিজ্ঞেসই করে বসেছিল—'আচ্ছা শুনেছি, কলকাতায় নাকি এমন একজন লম্বা মানুষ ছিল, যে রাস্তার গ্যাসপোস্টের আগুন থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিত। থঙ্গরাজ কি তার ছেলে?'

যাই হোক, অত বড় মানুষটার জুতো পাওয়া তো সোজা নয়। থঙ্গরাজকে নিয়ে আমি, প্রদীপ এবং আরও কয়েকজন খেলোয়াড় দোকান থেকে দোকানে ঘুরছি তো ঘুরছি। বাটার প্রায় সব দোকানে ঢুঁ মেরেছি। কোথাও ওর পায়ের মাপের জুতো পেলাম না। অথচ তখনই একজোড়া কেডসের দরকার।

অনেক ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত পেলাম চীনা বাজারের এক দোকানে। এবং পেলাম বিনি পয়সাতেই। দোকানদার বললেন, 'বহুকাল ধরে ওই জুতো জোড়া পড়ে আছে। অত বড় সাইজ কারও পায়ে লাগে না। আপনারা এশিয়ান গেমসে খেলতে যাচ্ছেন। আমি দাম নেব না। তবে জাকার্তা থেকে জিতে আসা চাই কিন্তু। দাম যদি দিতে হয় জিতে এসে দেবেন। আমি তখন নেব।'

ব্যাপারটা সামান্যই। এতকাল মনে ছিল না। পনেরো বছর আগের কথা তো। আজ লিখতে বসেই মনে পড়ছে, ওই দোকানদারের কাছে তো আর যাওয়া হয়নি। নিজেকে এখন অপরাধী ঠেকছে। অবশ্য দাম তিনি নিতেনও না। উলটে হয়ত তাঁর পকেট থেকে আরও কিছু বেরিয়ে যেত আমাদের আপ্যায়নের জন্য। তবু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমাদের তাঁর কাছে এক-বার যাওয়া উচিত ছিল।

দমদম থেকে আমাদের আকাশে ওড়ার কথা ছিল এয়ার-ইণ্ডিয়ার বিমানে। কিন্তু সকালে দমদম পৌঁছে শুনি এয়ার-ইণ্ডিয়ায় সিট পাওয়া যায়নি। যেতে হবে লুফৎহানসায়। অর্থাৎ জার্মান এয়ারলাইনসের বিমানে। খবর শুনে প্রথমে মনে একটু ধাক্কা লাগলেও আমরা সবাই এই পরিবর্তনকে সৌভাগ্যসূচক বলে মেনে নিয়েছিলাম। কারণ, আগে কয়েকবার এয়ার-ইণ্ডিয়ার বিমানে চেপে খেলতে গিয়ে আমাদের ফল ভাল হয়নি। বিমানের আর দোষ কী বলো, কিন্তু কুসংস্কার কাটানো শক্ত। অনেকেই কুসংস্কার মেনে চলেন—খেলোয়াড়রা বোধ হয় বেশিই মানেন।

যাই হোক, দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত হবার জন্যে আমরা আগে থেকে ঠিক করে নিয়েছিলাম অতুলপ্রসাদের "বলো বলো বলো সবে" গানটি হবে এশিয়ান গেমসে আমাদের সমবেত সঙ্গীত। সময় ঠিক ছিল না। সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি যখন খুশি শুরু করতাম। কোনো খেলায় হয়ত আমাদের ফল খারাপ হয়েছে, মনটাকে চাঙ্গা করার জন্য সবাই ধরতাম "বলো বলো বলো সবে।" আবার হয়ত আমাদের কোনো অ্যাথলিট স্বর্ণপদক জিতেছে তখনও সপ্ত সুরে শুরু হত ওই গান। ভিলেজে অনেক রাত্রে একজনের ঘুম ভেঙে গেলে সে আর কয়েকজনকে তুলে নিয়ে গাইতে শুরু করত কোমল-কর্কশ-মধুর-গম্ভীর নানা কণ্ঠের ওই কোরাস। অবাঙালী বন্ধুদের গানটির অর্থ বুঝিয়ে দেওয়ায় তারা বেশ আগ্রহ এবং উৎসাহের সঙ্গে গান গাইত। কিন্তু একটু মুশকিল হয়েছিল গানের উচ্চারণে। যেমন "বলো বলোকে" কেউ উচ্চারণ করত "বোলো বোলো।" "শ্রেষ্ঠ আসন লবে" কারও মুখে উচ্চারিত হত "ছ্রেস্ট্ আসন লেবে।" তবে আস্তে আস্তে অবাঙালী খেলোয়াড়দের উচ্চারণ অনেকটা শুধরে গিয়েছিল।

গানের গলা আমার কোনোদিনই নেই। বোধহয় সুরের মধ্যে বে-সুর বাজত আমার গলায় বেশি। তবু বহু ক্ষেত্রে আমিই প্রথম শুরু করতাম। সমবেত কণ্ঠে "বলো বলো" সুরের মধ্যেই দমদম থেকে চেপে বসলাম লুফৎহানসার বিমানে। সেদিন ছিল ১৫ আগস্ট, ১৯৬২ সাল। (ক্রমশ)

আঠা দিয়ে মুণ্ডু আঁটা

মনোজ বসু

দুকড়ি মাঝি, অথবা তেমাথা মাঝি। আমার তোমার একটা করে মাথা, দুকড়ির তিনটে। যেখান থেকে জঙ্গলের শুরু, তার ঠিক আগেই দুকড়ির বাড়ি। বাড়ির সামনে দুকড়ি প্রায়ই উবু হয়ে বসে থাকে। হাঁ, তিন মাথাই তার—এক, দুই, তিন করে গুনে দেখ, ঠিক-ঠিক তিনটে।

কেমন করে হয়, বলো দিকি। মাথা আসলে একটাই। বড্ড বেশি বুড়ো হয়ে গিয়ে সর্বক্ষণ কাঁপে—মাথা দু-হাঁটুর মধ্যে গুঁজে বসে থাকে সে। দূর থেকে দু-পাশের হাঁটু দুটোও মাথার মতো দেখায়। মনে হয়, তিন মাথা পাশাপাশি।

সুন্দরবনের একাল-সেকাল দুকড়ি মাঝির নখদর্পণে। বলতে বলতে ফোঁস করে সে নিশ্বাস ফেলে : কীই বা আছে এখন? মানুষ এসে কিলবিল করছে, গাছগাছালি কেটে তারা ঘরবসত বানায়। বাঘ-সাপ কুমির-কামট সবই প্রায় লোপাট। দানো-পোড়ো ভূত-বেহ্মদত্যি পেত্নী-শাকচুন্নির এত যে দাপট ছিল, সারা জঙ্গল ঘুরেও কোন-একটার এখন হদিস মেলে না। সুন্দরবনের বন চলে গিয়ে সুন্দরই হচ্ছে দিনকে-দিন। সেকালের নাম কয়েকটা আছে শুধু। দানোর খাল, কালোদানোর গড়, কোদালঝাড়া—

দানোর খাল দিয়ে যেতে যেতে চমক লাগবে—সমতল দেশ-ভুঁইয়ের মধ্যে পাহাড় এল কোত্থেকে? কোদালঝাড়ার পাহাড়। এ-পাহাড়ে এক কুচি পাথর নেই, প্রকাণ্ড মাটির-ঢিবি অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। সাগরের কাছাকাছি ঘনঘোর জঙ্গলে দানোরা থাকত। সর্দার কালোদানো ভারী দুর্দান্ত, ডাঙা জল তোলপাড় করে বেড়াত। মাটির নীচে গড় বানিয়েছিল সে। গড়ের পরিখা বড় গাঙের সঙ্গে মিশিয়ে দিল—তারই নাম দানোর খাল। এক রাত্রির মধ্যেই নাকি খাল কাটা শেষ। সকাল হবার আগেই কাজ সাঙ্গ করে সবগুলো কোদালের মাটি একটা জায়গায় ঝেড়ে দিয়েছিল—তাই হল কোদালঝাড়া। কতগুলো দানো কত কোদালে কাজ করেছিল, বোঝ। এত যে ছিল, এখন নেই—একেবারেই নেই। দুকড়ি মাঝি—নিতান্ত বালক সে তখন—সর্বশেষ একটাকে দেখেছিল। ভারী একজোড়া গোঁফ ছিল বলে তাকে গুঁফোদানো বলত।

ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘণ্টেশ্বর থাকে। ছেলে হাউই, মেয়ে তুবড়ি। তুবড়ি ছোট, মা নেই, বাপ-ভাইয়ের বড় আদরের। ছোট্ট ডিঙি আছে, ডিঙি ভাসিয়ে বাপে-ছেলেয় বনে ঢুকে যায়। কাঠ কাটে, চাকের মধু ভাঙে, হরিণ মারে, মাছ ধরে, খেপলাজাল ফেলে। সেদিনও বেরিয়েছে। কাছাকাছি শুকনো কাঠ মেলে না—কেটে কেটে লোক শেষ করে ফেলেছে। যেতে যেতে যেতে—বিস্তর দূর চলে গেল। বোঝা আষ্টেক কাঠ হয়েছে, এবারে মাছ মারা। মাছ পড়ে না তেমন—খালি জাল উঠে আসে। "এগিয়ে চল্ হাউই, জোরে জোরে বোঠে মার্, আরো-আরো—"

হু-হু করে ডিঙি ছুটেছে। হঠাৎ নাকে সুবাস এল। কোন্ ফুল ফুটছে না-জানি, গন্ধটা অতি উপাদেয়। মাছের ধান্দায় জলের পানে নজর—পাড়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখেনি। আরে, এ কোথায় এসে গেছে! কোদালঝাড়া নিশ্চয়—এরকম মাটির পাহাড় কোদালঝাড়া না হয়ে যায় না। "ডিঙিটা পাড়ে ধর্ হাউই, কোন ফুল দেখে আসি। তুই বরঞ্চ উনুন ধরিয়ে ততক্ষণে ভাত চড়িয়ে দে।"

জমসের মজার আস

১০০১ টি পুরস্কার জিতে নাও!

যে সংখ্যাটি নেই সেটি কি?

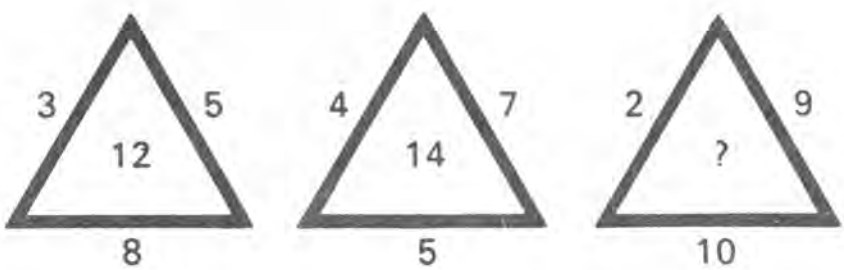

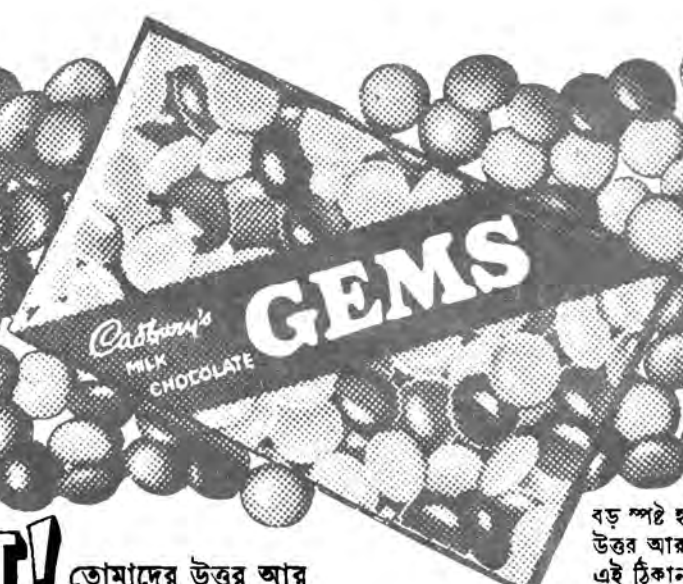

শিগগীর! তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্ জেমসের একটি খালি প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ১০০১ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্‌ট চেক পাবে।

বড় স্পষ্ট হরফে শুধু ইংরেজিতে তোমাদের উত্তর আর নাম ও ঠিকানা লিখবে। এই ঠিকানায় পাঠাও:
"Fun with Gems" Dept **E-34**
Post Box No. 56, Thane 400 601
উত্তর পৌঁছবার শেষ তারিখ:
৩১শে অক্টোবর, ১৯৭৭

রঙ বেরঙের চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস

CHAITRA-C-69 BEN

কোদালঝাড়ার উপরে উঠে গেল। দিব্যি চৌরস জায়গা। ঝুপসি-ঝুপসি কয়েকটা চারাগাছ, তারই একটায় ফুল ধরেছে। সোনার বর্ণ, হুবহু পদ্মফুলের চেহারা। এক ফুলেই চারিদিক আলো। ফুলটা তুলে নিই—ঘণ্টেশ্বর ভাবল, তুবড়ি বড্ড খুশি হবে ফুল পেয়ে।

টান দিয়েছে—বোঁটা না ছিঁড়ে গাছসুদ্ধ উপড়ে এল। খ্যা-খ্যা করে অমনি খেঁকশিয়ালের উৎকট আওয়াজ। মাটি ফুঁড়ে সরু-লিকলিকে হাত বেরিয়ে লম্বা লম্বা আঙুলে ফুল ও ফুল-গাছ সমেত ঘণ্টার কোমর আঁকড়ে ধরল। আকাশে তুলে ধরেছে। পাঁচ আঙুলে আবদ্ধ ঘণ্টা আরশুলার মতো কিলবিল করছে আর চেঁচাচ্ছে, "ওরে হাউই, ছুটে আয়। ধরেছে আমায়—নিয়ে চলল।"

পাড়ে লাফ দিয়ে হাউই ছুটল। লম্বাধিড়িঙ্গে হাড্ডিসার হাত দ্রুত মাটির তলে নেমে যাচ্ছে। চকিতে হাত অদৃশ্য, ফুল ও ফুলগাছ নেই, ঘণ্টাও নেই। কোনখানটায় সেই ফুলগাছ ছিল, চিহ্নটুকুও খুঁজে মেলে না। এদিক-সেদিক অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করল, তারপর নিরুপায় হাউই শুকনো-মুখে ডিঙি ঘুরিয়ে বাড়িমুখো চলল।

বাড়ি চারদিনের পথ। তুবড়ি পথ চেয়ে আছে। ভাইয়ের কাছে শুনল, বাবা দানোর কবলে। গর্জাচ্ছে তুবড়ি, "চলো দাদা দানোর খালে—সেই কোদালঝাড়ায়। আনবই বাবাকে উদ্ধার করে। দানোর উচিত-শাস্তি দেব।"

"আজই চলো, এক্ষুনি চলো"—তুবড়ি দিশা করতে দেয় না। বলে, "যত দেরি করবে নিশানা পাওয়া কঠিন হবে ততই। চলো—"

আবার রওনা। দু-জনে দুই বোঠে ধরেছে। চারদিনের পথ আড়াই দিনে সন্ধ্যার পর পৌঁছে গেল। গোলঝাড়ে ডিঙি ঢুকিয়ে দিল—কেউ না দেখতে পায়। নতুন ফুল ফুটেছে আবার, গন্ধে টের পাওয়া যাচ্ছে। ভাই-বোনে পা টিপে টিপে সারা রাত্রি টহল দিয়ে বেড়াল—কোদালঝাড়ার উপরেও গেল কতবার। দানোর ঘাঁতঘোঁত যদি মেলে, যদি সে চরতে ফিরতে বেরোয়। কিছুই না—ঘনান্ধকার জঙ্গল, ঝিঁঝিঁ ডাকছে, জোনাকি উড়ছে। কী করা যায়? গোলঝাড়ের ভিতর ডিঙিতে ফিরে গিয়ে ভাই-বোনে অনেক শলাপরামর্শ হল। ফুল না তোলা অবধি দানোমশায়ের টনক নড়বে না, মনে হচ্ছে।

সকালের আলো ফুটল। গোলঝাড় থেকে বের করে কোদাল-ঝাড়ার ঠিক নীচেই ডিঙি নিয়ে এসেছে। হাউই বিষম ছুটতে পারে (নাম সেইজন্য হাউই)—এক ছুটে সে কোদালঝাড়ার উপরে উঠে গেল। ঝুপসি-ঝুপসি চারা—তারই একটায় সোনার পদ্ম। হাউই তিলার্ধ দেরি করে না—ফুলসুদ্ধ চারা পড়্-পড়্ শব্দে উপড়ে নিয়েই দৌড়। দৌড়ে কে তার সঙ্গে পারবে—লহমার মধ্যে নীচে। পাতাল থেকে লিকলিকে হাত বেরিয়ে এসেছে, নাগাল পাচ্ছে না, মুঠো করে ধরতে গেল তো এক লম্ফে হাউই ডিঙির উপর। বোন তুবড়িও বোঠে নিয়ে তৈরি—ঝপাং-ঝপ ঝপ-ঝপ করে টানের পর টান। ফুলগাছ হাঁটুর নীচে চেপে হাউইও বোঠে মারছে, ডিঙি যেন উড়ে চলেছে। হাত তবু পিছু ছাড়ে না—ডিঙি যত দূরে যাচ্ছে হাত লম্বা হয় ততই। এক মাইল দু-মাইল লম্বা হয়ে গেল দেখতে দেখতে। তারপর ক্যাঁক করে হাউইকে মুঠির মধ্যে এঁটে ধরল। টানছে—কাঁছি বেঁধে নৌকোয় গুণ টানার কায়দায়। যে টানে ডিঙি তরতর করে উজানে ছোটে। তুবড়ি ক্রমাগত বোঠের ঘা মারে, হাতের মুঠি খোলে না। চোর-ডাকাতের ভয়ে ডিঙিতে ধারালো রামদা থাকে—রামদা দিয়ে কোপের পর কোপ মারছে, কাটে না। ঠং-ঠং করে বাজে—হাত যেন ইস্পাতের।

ডিঙি কোদালঝাড়ায় এসে পড়ল। হাত গুটিয়ে নিচ্ছে এবার—সাপের ফিতে গোটানোর মতো। হাউইকে শূন্যে তুলছে তুবড়িও ছাড়নপাত্র নয়—দাদাকে দানোর হাতে ছেড়ে ঘরে ফিরবে বলে আসেনি। সর্বশক্তিতে গলা এঁটে ধরে হাউই-এর সঙ্গে সে-ও ঝুলতে-ঝুলতে চলল। ফুলগাছ যেখান থেকে উপড়েছে, সেই জায়গায় সুড়ঙ্গ এখন। সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে হাত সড়াক করে নীচে নিয়ে ফেলল। কোদালঝাড় আসলে কতকগুলো মাটির ঘর—মাটির দেয়াল, মাটির মেঝে, মাটির ছাত, ছাতের উপরটা মাটির ঢিবি। ঘর বলে বোঝার উপায় নেই কিন্তু উপর থেকে।

এক-দু মাইল লম্বা হাত গুটিয়ে গুটিয়ে এখন সাধারণ মাপে এসে গেছে। হাতের যে মালিক, তাকেও দেখা যাচ্ছে। ভারী এক জোড়া গোঁফওয়ালা বেঁটে-খাটো জওয়ান। পাতালঘরে দুম করে সে ছুঁড়ে দিল ভাই-বোনকে। তুবড়ির উপর খিঁচিয়ে ওঠে, "কে রে তুই ছোঁড়ার ঘাড়ে চেপে এলি? সুড়ঙ্গ খোলা আছে—বেরিয়ে যা। বিনি দোষে আমরা আটকাইনে।"

চট করে তুবড়ি মতলব ঠিক করে নিয়েছে। খুব মিষ্টি করে বলে, "জানেন না দাদু, বাইরে আপনার ভারি সুযশ। সেকালে কালোদানো মশায় ছিলেন, আর একালে আপনি—"

ঘাড় নেড়ে গুঁফোদানো বলে, "যাঃ, বাজে কথা।"

"বাজে হলে নিজের ইচ্ছেয় এই মাটির তলে আসতে যাব কেন?" কাতর কণ্ঠে তুবড়ি বলে, "কষ্ট করে এসে পড়েছি—ধুলোপায়ে তাড়াবেন না দাদু। ক'টা দিন থেকে আপনার কিছু সেবাযত্ন করে যাব।"

গুঁফোদানো হা-হা করে হেসে উঠল। বলে, "এখানে থাকার বিষম ঝামেলা—সে ঝামেলা বিনি দোষে কেন নিতে যাবি? আচ্ছা, বোস একটুখানি—ছোঁড়াটার ব্যবস্থা করে আসি। থাকা হবে না—ঘটি খানেক মিষ্টি দুধ খেয়ে জিরিয়ে নিয়ে হাসতে-হাসতে নাচতে-নাচতে ফিরে যাবি।"

দেয়ালে খাঁড়া ঝোলানো—বলির পাঁঠা কাটে, সেই রকম জিনিস। হাতে সেই খাঁড়া—মুষ্টিবদ্ধ হাউইকে টানতে টানতে সামনের ঘরটায় নিয়ে গুঁফোদানো ঘড়াং করে দুয়োর বন্ধ করল। আরে সর্বনাশ, খাঁড়া নিল কেন হাতে? দুয়োরে একটুকু ছেঁদা—তুবড়ি চোখ রাখল। হাউইকে সোজা দাঁড় করিয়ে খাঁড়ার এক কোপ গলায়। ধড় আলাদা হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। মুণ্ডুও পড়ছিল—গুঁফোদানো ক্রিকেট-খেলোয়াড়ের মতো লুফে নিল সেটা। তুবড়ি দেখছে—সর্বাঙ্গ কাঁপছে তার। ধড়টা কাধে ফেলে গুঁফোদানো মুণ্ডু এক হাতে আর খাঁড়া অন্য হাতে নিয়ে হেলতে দুলতে অতি অবহেলায় ওদিককার দরজা দিয়ে কোন দিকে বেরিয়ে গেল।

দাদার পরিণাম তুবড়ি চোখের উপর দেখল। হাউ-হাউ করে কাঁদছে সে, দেয়ালে মাথা খুঁড়ছে। গুঁফোদানো এসে পড়ল। হাতে দুধের ঘটি, এবং সেই খাঁড়া। খাঁড়া যথাস্থানে টাঙিয়ে রেখে বলল, "শখ করে এসে কাঁদিস কেন এখন? দুধটুকুতে চুমুক দিয়ে সুড়ঙ্গের খাঁজে-খাঁজে পা রেখে উপরে উঠে যা। বলেই তো দিয়েছি, বিনি দোষে আমরা আটকাইনে। সর্দারের মানা।"

তুবড়ি গোঁ ধরে বলে, "যাব না আমি। বাপ-ভাই সব গেল—কার কাছে থাকব?"

"দোষ করেছে, শাস্তি হবে না?"

তুবড়ি ঝঙ্কার তোলে, "গাছের একটা ফুল তুলেছে, তাই আবার দোষ!"

গুঁফো বলে, "আমাদের শখের ফুল নয়। ফুল ঝরে গিয়ে গুটি, গুটি থেকে ফল—মস্ত বড় বেলের মতন। পদ্মবিল্ব যার নাম। ঐ ফলে আমাদের জীবন—বিস্তর কষ্টে আর্জাতে হয়।"

"তা সে যাই হোক," তুবড়ি খুব কাতর হয়ে বলল, "না বুঝে একটা ফুল তুলে ফেলেছে, সেই দোষে মেরে ফেলবেন দাদু?"

বড় হয়ে ওঠার খুশীতে এই মেয়েটির মন ভরপুর আপনার কন্যা ও পুত্র এই মেয়েটির মতোই নিশ্চিন্ত যে তাদের ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, বিবাহ সব-কিছুরই সুব্যবস্থা আপনিই করবেন। সানন্দে এই দায়িত্ব পালন করতে এখন থেকেই আপনি উন্মুখ। তাই না?

আপনার পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ সুখী ও নিশ্চিন্ত করতে আমাদের যে কোন সঞ্চয় প্রকল্প থেকে আপনার সঞ্চয়ের আয় অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারেন।

আমাদের ৫০০০৲ টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে ২৫ বছর পরে আপনি পাবেন ৬০,২৮৫.৬০ টাকা। তাছাড়া রয়েছে আমাদের ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট, এণ্ডাওমেণ্ট বেনিফিট ডিপজিট, মাসিক আয় সার্টিফিকেট, রেকারিং ডিপজিট এ্যাকাউণ্ট প্রভৃতি নানা সঞ্চয় প্রকল্প।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ ৭, রেড ক্রস প্লেস
কলিকাতা-৭০০০০১ ● টেলিফোন ঃ ২৩-৯৭৮৪ (৩টি লাইন)
॥ অথবা আমাদের যে কোন শাখা অফিস ॥

Progressive/UIB

গুঁফোদানো হেসে বলে, "মেরেছি—কে বলল রে পাগলি?"

তুবড়ি বলে, "নিজের চোখে দেখে ফেলেছি আমি। খাঁড়া তুলে ড্যাডাং করে কোপ ঝাড়লেন, ধড় মুণ্ডু আলাদা হয়ে পড়ল।"

"মুণ্ডু আলাদা, ধড় আলাদা—তা বলে মরেনি। খাঁড়ায় ঐ দেখ্ এক ফোঁটা রক্ত নেই। লোহা-ইস্পাতের নয়, তালপত্তোর-খাঁড়া—কোপ দিলে কাটে না—জোড় খুলে আলাদা হয়ে যায়।"

তুবড়ি শুধোয়, "ধড় মুণ্ডু জোড়া দেওয়াও যায় তা হলে—কী বলেন দাদু?"

গুঁফোদানো বলে, "দেব তাই। দুধ-টুধ খেয়ে তুই ড্যাং-ড্যাং করে ঘরে ফিরে যা, কয়েকটা মরশুম কাটিয়ে ওরাও দেখিস দুম করে একদিন গিয়ে পড়বে।"

এ-সব আশ্বাস নিয়ে খুশি হবার মেয়ে তুবড়ি নয়। প্রবল মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, "কাটা মুণ্ডু কখনো বেঁচে থাকে? আমায় ভাঁওতায় ভুলোচ্ছেন দাদু। খাব না আমি, কোথাও যাচ্ছনে। এইখানেই আপনার কাছে পড়ে মরে থাকব।"

গুঁফোদানো মুশকিলে পড়েছে মনে হয়। নির্দোষ মানুষ ঝপাত করে আস্তানায় এসে পড়েছে—অতশত ঠাহর করে দেখোনি। এখন এই আবার গোঁ ধরে বসল। সর্দার-দানো ফেরার আগে যে-ভাবে হোক সরিয়ে দিতে হবে।

"বড্ড রেগেছিস তুই," গুঁফো খল খল করে হাসে। বলল, "ঢুকে যা ওখানে ঐ ঘরে। তারপর বাঁয়ের দরজা দিয়ে আরও ভিতরে যাবি। লাইনবন্দি সব রয়েছে। কণ্ট নেই—আরামসে শুয়ে আছে সব। সত্যি-মিথ্যে চোখে দেখে আয়। ইচ্ছে হলে এক-আধটা কথাও বলতে পারিস। তাড়াতাড়ি ফিরবি, তোকে উপরে পাঠিয়ে সুড়ঙ্গ বন্ধ করব।"

তাই বটে। মেঝে-জোড়া ফরাস—পাঁচ জন পাশাপাশি পড়ে রয়েছে। হাউই সদ্য এসেছে—দরজার কাছাকাছি সে। পাশে বাপ ঘণ্টা। ওদিকটায় পর পর আরও তিনটি। চাদরে ঢাকা—মুখগুলো কেবল বাইরে। নিঃশব্দে শুয়ে পড়ে চোখ পিট পিট করছে, তুবড়ির দিকে একসঙ্গে পাঁচ-দুনো দশ চোখে সকলে তাকিয়ে পড়ল।

তুবড়ি ডুকরে কেঁদে ওঠে, "অমন করে চেয়ে কেন বাবা—চিনতে পারছ না?"

ঘণ্টা জড়িতকণ্ঠে বলে, "কেমন করে এলি তুই মা?"

"আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব।" ঝাঁপিয়ে পড়ল সে বাপের উপর। আরে সর্বনাশ. বাবা পুরোপুরি তো নয়—চাদর উল্টে ফেলল—গলা অবধি মুণ্ডুখানা মাত্র, নীচের দিকে কিছুই নেই। দেখতে উৎকট. সেই জন্য চাদর ঢাকা দিয়ে রেখেছে। হাউয়ের চাদরও উঁচু করে তুলল—ঠিক এক অবস্থা।

তুবড়ি কেঁদে বলে. "তোমাদের ধড় কোথায় গেল বাবা?"

ঘণ্টা বলে, "কী জানি কোথায়। কেটে ফেলল, সেই থেকে আর দেখিনি।"

ওদিক থেকে এক মুণ্ডু বলে উঠল, "সবুর করো না, কতবার দেখতে হবে। আষাঢ় মাস আসুক বর্ষা নামুক—গরজে পড়ে ওরাই ধড় টেনে-টেনে আনবে, মুণ্ডুর সঙ্গে নম্বর মিলিয়ে জুড়ে দেবে। সারাটা দিন তারপর কোদালঝাড়ার ঢিবির উপরে কোদাল মারো, আর নিজের হাত-পা বুক-পেট যত খুশি চেয়ে চেয়ে দেখ। সন্ধে হলেই আবার আলাদা—মুণ্ডু এনে বালিশে শোয়াবে, ধড়-গুলো কোথায় গুদামজাত করবে—ধড়ের যদি মুখ থাকত জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতাম।"

তুবড়িকে কাছে ডাকল সে, "শোন মেয়ে, আমি হলাম পয়লা-নম্বুরি—এখানকার সবচেয়ে পুরানো। চার মরশুম কেটে গিয়ে এইবার পাঁচে পা দিচ্ছি। আমার চেয়ে বেশি কেউ বলতে পারবে না। আমারও ছেলেমেয়ে আছে—চার চারটে বছর তাদের দেখিনি। শুধু নিজের বাপ-ভাইকে উদ্ধার করলে হবে না মা আমা-

দেরও নিয়ে যেও। না বুঝে আমিও ফুল তুলতে গিয়েছিলাম।"

অপর দুই মুণ্ড সমস্বরে বলে উঠল, "আমিও—আমিও—"

বন কেটে বসত হয়ে যাচ্ছে—যত দানো সুন্দরবন ছেড়ে উত্তরে আস্তানা নিয়ছে। আছে সামান্য কয়েকটি। স্বর্ণবিল্ব বিহনে ওদের প্রাণ বাঁচে না। বাঘকে এক-আধটা ছুঁড়ে দেয়, কেনা-গোলাম হয়ে থাকে তারা, দায়ে-বেদায়ে হাঁক পাড়লে হামলা দিয়ে এসে পড়ে। লোভে লোভে হরিণ এসে দাঁড়ায়—মুখের কাছে এক আধ টুকরো ফল ফেলে দুধ দুয়ে নেয়। সেই মিঠা দুধই তুবড়িকে খেতে দিয়ে আতিথ্য করছে। পাকা স্বর্ণবিল্বে বেলেরই মতন আঠা বেরোয়। সাংঘাতিক আঠা—মুণ্ডু অবধি আঁটা যায়। সর্বকর্মে স্বর্ণবিল্ব চাই—কিন্তু ঝারকিতে অশেষ খাটনি। তার উপর লোকাভাব হয়ে পড়েছে। ফুল তুলেছে এই ছুতোয় তাই লোক আটকে রাখে।

ফুল হয়ে পড়েছে এখন মানুষ ধরার ফাঁদ।

গুঁফোর কাছে ফিরে তুবড়ি শতকণ্ঠে সুখ্যাতি করে, "আপনি দাদু বিষম সাচ্চা, যা বলেছেন বর্ণে-বর্ণে সত্যি। মুণ্ডুমশায়দের সঙ্গে কথা বলে এলাম, বালিশ মাথায় দিব্যি সব আরাম করে আছেন।"

খুশিমুখে তুবড়ি দুধের ঘটি তুলে চুমুক দিল। বলে, "ধড়-দের তো দেখলাম না দাদু। তাঁদের জন্যেও নিশ্চয় গদি-তোষকের ব্যবস্থা?"

গুঁফোদানো বলে, "কী বোকা তুই? বোধ-জ্ঞান কিছুই তো নেই, গদি-তোষক কী করবে তারা? এক-একখানা শুকনো কাঠ যা, তারাও তাই। ঘরের মেজেয় গাদা-দেওয়া পড়ে আছে, দরকারে এনে মুণ্ডুর সঙ্গে জুড়ে দেব। সঙ্গে সঙ্গে অমনি পুরোদস্তুর মানুষ।"

তুবড়ি বলে, "এমনি এমনি আটক রাখলেই তো হয় দাদু। মুণ্ডু কেটে আলাদা করেন কেন? এ বড় বিশ্রী।"

"হেঁ-হেঁ—কেন বল্ দিকি?"

একটুখানি ভেবে নিয়ে তুবড়ি বলে, "পালাতে না পারে। মুণ্ডুর তো হাঁটবার পা নেই—যেখানে রাখবেন পড়ে থাকতে হবে।"

"পা থাকলেও পালানোর জো নেই এখান থেকে। টুক করে শিকলি টেনে দেব, সঙ্গে সঙ্গে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ। মাছিটার পিঁপড়েটারও আর তখন বেরুনোর উপায় থাকে না।

তুবড়ি অবোধ চোখে তাকিয়ে আছে। দানো বুঝিয়ে দিচ্ছে, "মুণ্ডু কেটে খাবার বাঁচাই। খাওয়া হয় বটে মুণ্ডুর মুখ দিয়ে, কিন্তু ধড়েই সব টেনে নেয়। ধড় আলাদা হলে তখন আর খাওয়ার কী গরজ? মরশুম এসে গেলে খাটনির জন্য হাত-পায়ের দরকার পড়ে যায়। ধড়ে-মণ্ডুতে জুড়ে ফেলি, খেতেও দিই দিনের বেলা। সন্ধ্যার পর কাজ থাকে না—জোড় কেটে দিই, খাওয়ারও ঝামেলা থাকে না আর তখন।"

"বাঃ বাঃ!" তুবড়ি শতকণ্ঠে তারিফ করছে, "কী বুদ্ধি আপনার দাদু! আমাদের মানুষের সমাজে মুণ্ডু আলাদা করা যদি চালু হয়—অর্ধেক রেশনেই চলে যাবে, কেউ আর না-খেয়ে মরবে না।"

গুঁফোর সঙ্গে গল্প জমিয়েছে, নজর কিন্তু দেয়ালের খাঁড়ার দিকে। আচমকা খাঁড়া টেনে নিয়ে কচাৎ করে গলায় কোপ। মুণ্ডু ছিটকে পড়ল, ধড়ও ভুঁয়ে গড়াচ্ছে।

চোখ পাকিয়ে কাটামুণ্ডু বলে, "এ কী—অ্যাঁ, পেটে-পেটে এত শয়তানি তোর? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা—"

চোখ-পাকানো ও তর্জনগর্জনে তুবড়ি এখন ভয় করতে যাবে কেন? হাত-পা ছাড়া শুধু মুণ্ডুর কী ক্ষমতা? হেসে শতকুটি হচ্ছে তুবড়ি। বলে, "ভালই তো হল, তোমারও খাওয়াদাওয়ার ঝামেলা রইল না। থাকো তবে, আমি চললাম। হাত-পা নেই যে শিকল টেনে সুড়ঙ্গ বন্ধ করে দেবে। ধড়টা নিয়ে যাচ্ছি দাদু, দানোর খালে ভাসিয়ে দিয়ে যাব—তোমার আপনজনেরা এসে

আবার না জুড়ে দেয়।"

ঠ্যাং ধরে সত্যি সত্যি টানছে। দানোর তখন থরোথরো এই কাঁপুনি। কাতরাচ্ছে, "নিয়ে যাস নে—জুড়ে দিয়ে যা, লক্ষ্মী সোনামণি নাতনিটি আমার—"

কাটা মানুষগুলোর ধড় কোথা রেখেছ, বলো।

"মুণ্ডু ধড় আমার জুড়ে দিবি তাহলে?"

তুবড়ি ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"সত্যি বলছিস? তিন সত্যি কর্—"

"জুড়ব, জুড়ব, জুড়ব।"

গুঁফো তখন বলে দিল, "যে ঘরে মুণ্ডুদের বিছানা তারই দক্ষিণের বারান্দায় ধড়েরা গাদা হয়ে আছেন। একটিও ফেলিনি।"

এক ছুটে তুবড়ি বারান্দায় গেল। ঘণ্টা হাউই আপন জন। তাদের ধড় নিমেষে চিনে নিয়ে মুণ্ডুর পাশে পাশে পরম যত্নে এনে রাখল। অন্য তিনটাও এনেছে। পয়লানম্বরি মুণ্ডুকে বলে, "বুড়োমানুষ আপনি—বুকের পাকা লোম দেখে বুঝছি এই ধড়খানা আপনারই। কী বলেন?"

"হুঁ" বলে বুড়ো পয়লা-নম্বর সায় দিল।

আর এক মুণ্ডু বলে ওঠে, "ডানহাতে আমার ছয় আঙুল। গুনে দেখ, যে ধড়ে আছে সেইটা আমার।"

এবং চারজনের যখন মিলে গেল, বাকি ধড় বাকি মুণ্ডু একই মানুষের।

তুবড়ি গিয়ে বলে, "ধড় পেয়ে গেছি। দাদু তুমি পরম সত্যবাদী।"

গুঁফো-মুণ্ডু বলে, "তোর সত্যিও রাখ্। ধড়ের সঙ্গে আমায় এঁটে দে এইবারে।"

"আঁটব কেমন করে বুঝিয়ে দাও।"

"শক্ত কিছুই নয় রে। লাল আঠা কিছু বেশি ঘন—গলার নলির মুখে ওটা লাগাবি। সাদা আঠা পাতলা—ওটা বাইরের দিকে মাখাতে হয়। মাখানো হয়ে গেলে আলগোছে আমায় নিয়ে ধড়ের উপর বসিয়ে দেওয়া। দেখবি, এমন আঁটা এঁটে গেছে—কখনো যে কাটা পড়েছিল শতেকবার ঠাহর করেও কেউ ধরতে পারবে না।

খিঁচিয়ে উঠল কাটামুণ্ডু, "হাত কোলে করে বসে রইলি যে বড় ?"

তুবড়িও সমান সুরে জবাব দেয়, "আঠা তো চাই। কোথায় সেরে রেখেছ ? বলি, আঠা বিনে আমি কি থুতু দিয়ে আঁটব ?

"তা বটে, তা বটে!" কাটামুণ্ডু বেকুব হয়েছে। বলে, "হাত নেই যে আঙুল তুলে দেখাব। দেয়ালের বড় কুলুঙ্গি ওরই মধ্যে সরায় আছে লাল আঠা, মালশায় সাদা আঠা। সামাল হয়ে পাড়িস রে, হাত ফসকে পড়ে না যায়।"

আঠা পেড়ে আনল। মুণ্ডু বলে, "এক কাজ কর্, দেয়ালের গায়ে আমায় খাড়া করে দে। নতুন হাত তোর—দেখে দেখে আমি বলে দিচ্ছি। গলার ঐখানটা সরার আঠা লাগা। বেশি করে লাগা—আরো—আর সামান্য একটু।"

ব্যাপারটা নিজের বলেই গুঁফোদানোর আগাগোড়া নিখুঁত নির্দেশ। "ব্যস, আর কিছু নয়—আমায় এবারে ঐ গলার উপর বসিয়ে দে। আরে আরে, যাচ্ছিস কোথা আমায় এইরকম খণ্ড করে রেখে ?"

এক হাতে সরা এক হাতে মালশা, তুবড়ি পলকে হাওয়া।

ঘরে ঢুকে গেছে সে, মুণ্ডুর পাশাপাশি ধড় সাজানো যেখানে। আঠা মাখিয়ে টপাটপ ধড়ে মুণ্ডুতে জুড়ছে। গুঁফো-দানোর শিক্ষায় এ-কর্মে তুবড়ি এখন রীতিমত ওস্তাদ। ধড়-মুণ্ডু পুরোপুরি মানুষ হয়ে লম্ফ দিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল।

তুবড়ি তাড়াচ্ছে, "এক মিনিটও দাঁড়িও না, সুড়ঙ্গর খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে উপরে উঠে যাও। গুঁফো অচল হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু দলবল এক্ষুনি এসে পড়তে পারে। বাইরেও দেরি কোরো —গোলের জঙ্গলে ডিঙি পেয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পোড়ো।"

ঘণ্টেশ্বর মেয়েকে বলে, "তুই ?"

"গুঁফোর ধড়মুণ্ডু জুড়ে দেব, তিন সত্যি করিয়ে নিয়েছে—তবেই তো তোমাদের ধড়ের হদিস দিল। সত্যি পালন করে যেতে সামান্য একটু সময় লাগবে। ভাবনা কোরো না বাবা, ডিঙি গোল-বন থেকে বেরুতে বেরুতেই গিয়ে পড়ব।"

কাটা-মুণ্ডুর সামনে দিয়ে আস্ত অখণ্ড মানুষ রূপে পর পর সকলে সুড়ঙ্গ বেয়ে উঠে গেল। গর্জাচ্ছে অসহায় গুঁফো মুণ্ডু। ঘণ্টার নজরে পড়ল, যে-খাঁড়ায় গুঁফোকে কেটেছে, মুণ্ডুর পাশেই সেটা পড়ে। হাবা কী রকম দেখ মুণ্ডু-ধড়ে জুড়ে তুবড়ি যেইমাত্র সত্যরক্ষা করবে, দানো তক্ষুনি তো তাকে দুই খণ্ড করবে—খাঁড়া একেবারে হাতের কাছে মজুত। তুলে নিল সে খাঁড়াটা—কাটা-মুণ্ডু কটমট করে তাকায়।

তুবড়ি সর্বশেষে। মুণ্ডু যাচ্ছেতাই গাল পাড়ে। "বেইমান শয়তান উল্লুক। আঠা মাখিয়ে ফেলে রেখে আমারই সেই আঠায় ওদের সব জুড়ছিলি ?"

তুবড়ি রাগ করে বলে, "গাল দেবে তো চলে যাচ্ছি। কিছুই করব না আমি।"

কাতর হয়ে দানো তাড়াতাড়ি বলে "কখন থেকে হা-পিত্যেশ পড়ে রয়েছি বল্ তো ?

তুবড়ি বলে, "বোঝ না কেন দাদু। ওরা হল কাঠ-কাটা মাছ-মারা সব মানুষ—ধড়ের উপর মুণ্ডুখানা যেমন-তেমন ভাবে আঁটলেই কাজ চলে যায়। আর তুমি হলে দানোদের সেরা গুঁফো দানো—হাত লম্বা করে করে করে আকাশের চাঁদটাও বোধহয় পেড়ে আনতে পার। তোমার মুণ্ডু আঁটা চাট্টিখানি কথা নয়—কাঁচা-হাত নিয়ে আমি সাহস পাচ্ছিলাম না। ওদের সব করে করে হাত পাকিয়ে এনেছি। কেমন আহা-মরি এঁটে দিই দেখ।"

বলতে বলতে মুণ্ডু বসিয়ে দিল দানোর ধড়ের উপর। "কী করলি তুই ? মুণ্ডুর মুখ যে পিছন দিকে পড়ে গেল—কী সর্বনাশ ?"

তুবড়িও জিভ কাটল, "তাই তো, ভুল হয়ে গেছে। তুমি যা বকাবকি লাগালে দাদু, বুদ্ধিশুদ্ধি সব ঘুলিয়ে গিয়েছিল। এখন উপায় ?"

তিক্তমুখে গুঁফো বলে, "উপায় আমার মাথা আর মুণ্ডু। আবার তো কেঁচে-গণ্ডুষ করা। এই মুণ্ডু কেটে আলাদা কর্ ধড় থেকে, নতুন করে আঠা মাখা—"

বলতে বলতে হুঁশ হল, "কাটবি তার খাঁড়াই তো নেই। তুলে নিয়ে পালিয়েছে।"

তুবড়ি বলে, "পালাবে কেন মনের ভুলে তুলে নিয়েছে হয়তো। বেশি দূর যায়নি—খোঁজো, নিয়ে আসছি আমি।"

তুবড়িও দ্রুত পায়ে উপরে উঠে গেল।

দুকড়ি মাঝি ছেলেমানুষ তখন, বাপের সঙ্গে দানোর খাল দিয়ে যেতে যেতে এক পলক ঐ উল্টোমুখ দানো দেখতে পেয়েছিল। বিশাল একজোড়া গোঁফ মুখের উপর, মুখের ঠিক নীচেই পিঠ। হাত-পা বুক-পেট সব উল্টোদিকে। থপ থপ করে পিছন পানে যাচ্ছিল—চোখ সেদিকে নয় বলে দেখতে পাচ্ছে না, জোরে যাবে কেমন করে ? গুঁফোকে দেখেই দুকড়ির বাপ তাড়াতাড়ি ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে নিল। দেখতে পেলেই নাকি বাঘের মতো গর্জাত আর লম্ফঝম্প করত। মানুষের উপর বড্ড রাগ।

ছবি বিমল দাশ

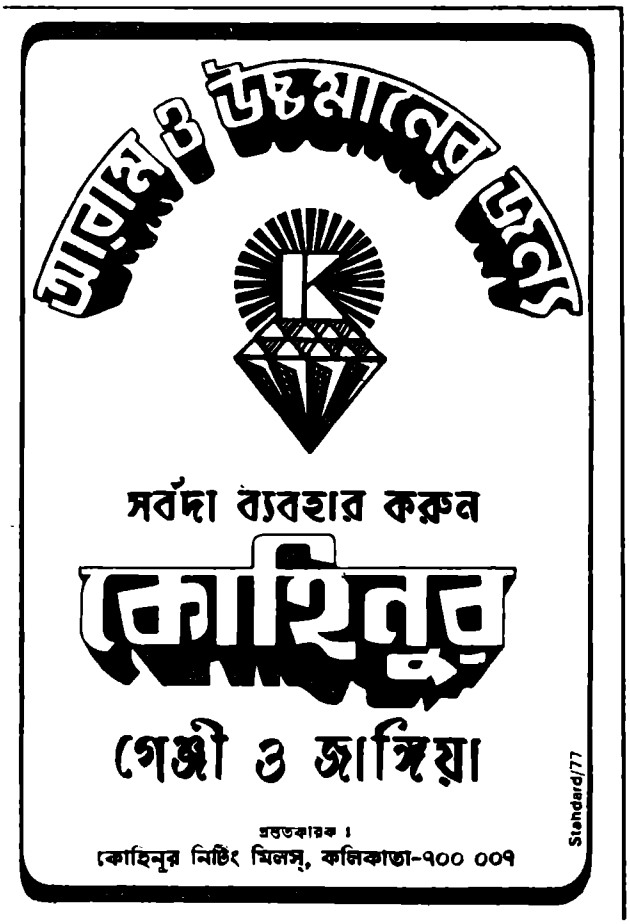

ভুতুড়ে গাড়ি

মুহূর্তে রাগ জল হয়ে গেল ভদ্রমহিলার...
আপনাকে এক চক্কর ঘুরিয়ে আনি, কেমন ?
বেশ তো !
53
53

এই গাড়ি চেপে ঘুরতে আমার দারুণ লাগবে
আমারও, মিস্ হ্যারিস্ !

নিকোলের এই গাড়ি চেপে ঘোরার প্রস্তাবে এককথায় রাজি হয়ে গেলেন মিঃ হুইটফিল্ড্...
আপনার সীটবেল্টটা এঁটে নিন।
?
53

বেশ নির্বিঘ্নে শুরু হল তাদের যাত্রা...
53
53

হার্বি, লাগা এবার। মনে রাখিস্, লোকটা কিন্তু অ্যালেঞ্জো হকের ভাগ্নে !

দেখুন, মিস্ হ্যারিস্, আবোল-তাবোল কথা বলে লাভ নেই। সাদামাটা এই ক্ষুদে গাড়িটা তো হাজারটা সাধারণ গাড়িরই মত একটা গাড়ি !

কথাটার ভেতরে ঠাট্টার গন্ধ পেয়ে হঠাৎ যেন খেপে ওঠে হার্বি...
53
5-19

তীরবেগে ছুটে চলে ব্যস্ত এক চৌরাস্তার মোড়ের দিকে...
!!!!!!!!
53
53

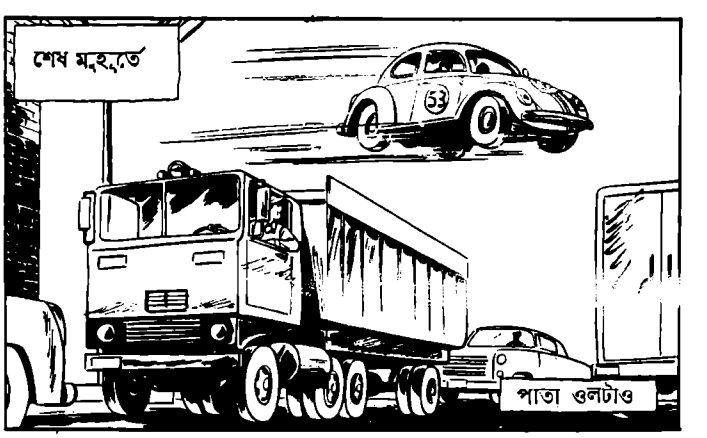
শেষ মুহূর্তে
53
পাতা ওলটাও

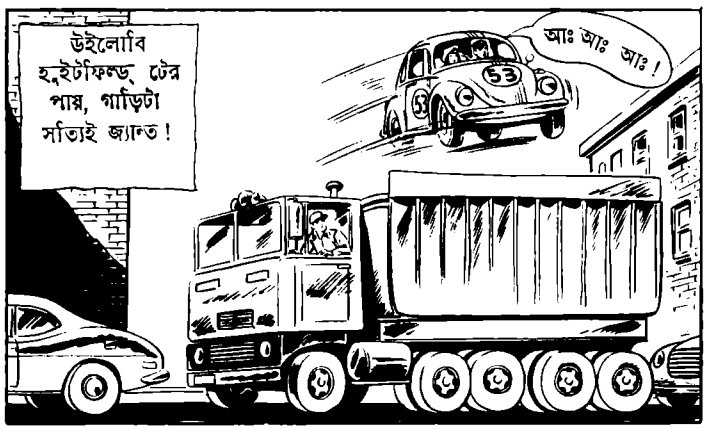
উইলোবি হুইটফিল্ড্ টের পায়, গাড়িটা সত্যিই জ্যান্ত!
আঃ আঃ আঃ!
53

খুব সাবধানে মাটি ছুঁয়ে হার্বি ছুটতে থাকে একটা বাঁক ঘেঁষে..
329
53

বৃথাই থামাবার চেষ্টা করছেন! ওকে ঠাট্টা করার জন্যে ক্ষমা চান, তবেই ও থামবে!

ঠিক আছে...হা-হার্বি, আমি, আমি দুঃখিত!
53

একঘণ্টা বাদে...কোটিপতি অ্যালেঞ্জো হকের হেড কোয়ার্টারে...
আপনার ভাগ্নে উইলোবির ফোন স্যার!
আচ্ছা!
5-26

কে? উইলোবি? বুড়িটাকে কাগজটায় সই করানো গেল?
না মামা, পারিনি..

অপদার্থ! আমি জানতুম তোমার দ্বারা কিছু হবে না! ঠিক আছে, ছেড়ে দিলাম!
এর পর আগামী সংখ্যায়

বিড়ালছানা

প্রথমে বিড়ালছানাগুলো দেখে ঘেন্নায় মরে যাচ্ছিল টুম্পা। গত রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছে, তাই ভয় পেয়ে কোথা থেকে জানি ওরা এসে টুম্পার খাটের নীচে আশ্রয় নিয়েছে। সকাল-বেলা ঘুম থেকে উঠেই ওদের দেখতে পেয়ে টুম্পার গা ঘেন্নায় রি-রি করে উঠেছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। ঘরে সারাদিনে আর একবারও যায়নি। শুধু সেইদিন নয়, পরপর তিন দিন সে ওই ঘরে যায়নি। কিন্তু একদিন তার মায়ের তাড়নায় সেই ঘরে তাকে যেতেই হল। কোনোমতে খাটে উঠতে যাবে এমন সময় একটা বিড়ালছানা তার পা জড়িয়ে ধরল। ভীষণ ভয় পেয়ে টুম্পা চিৎকার করতে যাবে, আর ঠিক তখুনি তার বিড়ালছানাটার দিকে চোখ পড়ে গেল। ভাল করে সে দেখল বিড়ালছানার গায়ের রঙ ধপ্‌ধপে সাদা, গায়ে একটুও কালো ছোপ্ নেই। চোখে কাকুতির চিহ্ন। খয়েরি রঙের দুটো চোখ। সারা গা লোমে ঢাকা। আস্তে আস্তে তাকে কোলে তুলে নিল টুম্পা। জড়িয়ে ধরে আদর করল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সে দেখল, যে দুধটুকু তার মা বিড়াল-ছানাদের খাবার জন্য দিয়ে গেছে তা বিড়ালছানা-গুলোর মা খেয়ে নিচ্ছে আর ছানাগুলো লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সেই দিকে। টুম্পা বড় বিড়ালটাকে হাত দিয়ে সরিয়ে কোলের ছানাটিকে বাটির কাছে নিয়ে গিয়ে তার মুখ বাটির মধ্যে ডুবিয়ে দিল, দেখাদেখি অন্য ছানাগুলো এসে দুধের বাটিতে মুখ ডুবিয়ে দুধ খেতে লাগল।

টুম্পার চোখে তখন ঘেন্না নয়, খুশির ছায়া।

শর্মিতা দাশগুপ্ত (বয়স—১৩)

আমার বন্ধু ফ্রা

থাইল্যান্ডে আমার ছোটবেলায় অনেক থাই বন্ধু ছিল। কিন্তু এবারে ব্যাংককে গিয়ে আমার একজন কোরিয়ান বন্ধু জুটল। তার সংগে আমার অদ্ভুতভাবে আলাপ হয়েছিল। আমার বাবার বন্ধু বিশ্বপতি ঘোষ ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করেন। তিনি ফ্ল্যাট - বাড়িতে থাকতেন। বাড়িটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সেই পাঁচিলের সামনে একটা সুইমিং পুল আছে। ঐ বাড়ির লোকেরা যে যখন খুশি স্নান করত। আমি আমার মামার বাড়ি না থেকে বিশ্বপতি কাকাদের বাড়ি থাকতাম। তার কারণ মামার বাড়িতে থাই খাবার খাওয়ার অসুবিধা এবং বিশ্বপতি কাকার বাড়িতে সুইমিং পুল থাকার সুবিধা। আমি একদিন সুইমিং পুলে স্নান করছি, একটা কোরিয়ান ছেলে তার বন্ধু ভেবে আমাকে ঠেলে ফেলে দেয়। কোরিয়ান ছেলেটাকে ঠিক আমার মতো দেখতে। জলে পড়ে গিয়ে আমার নাকে জল ঢুকে যায়, পায়ে চোট লাগে।

সুইমিং পুল থেকে উঠে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম 'হোয়াট ইজ ইয়োর নেম?' সে উত্তর দিল, "মাই নেম ইজ ফ্রা।" আমি তাকে ইংরাজীতে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি আমায় ঠেললে কেন?" সে উত্তর দিল, "আমি ভেবেছিলাম তুমি আমার বন্ধু।"

তার সংগে পরিচয় হওয়ার পর জানলাম যে, তারা কোরিয়া থেকে এসেছে, ব্যাংককেই থাকে এবং তার বাবা জুডো লড়েন। সেই থেকে ফ্রা আমার বন্ধু এবং তারপর থেকেই আমরা একসংগে অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কাটতাম। ফ্রা-ই আমায় সুইমিং পুলে সাঁতার শিখিয়েছিল।

জয়নন্দন হালদার (বয়স ১১)

খেলোয়াড় পেলে

এক যে আছেন বলের রাজা
নামটি তাঁর পেলে,
হাজার প্রাইজ পেলেন তিনি
ফুটবল খেলা খেলে।
এবার তিনি আসছেন এই
শহর-কলকাতায়,
তাই-তো তাঁর গুণ-গাইছি
ছড়ায় কবিতায়।
ঠিক জানি না ছড়া তিনি
পছন্দ কি করেন?
বল খেললেও একটু-আধটু
ছড়া বোধহয় পড়েন।
সবাই জানে পেলের মত
খেলোয়াড় আর নেই,
তাই পেলে খুব খুশি মনে
মাঠে নামেন যেই,
লোক-গুলো সব ছুটে এসে
গড় করে তার পায়ের কাছে
বাড়িয়ে খাতা বলে শুধু
একটা 'সাইন' দিন!
পেলের সাইন পেল যারা,
নাচে তাধিন-ধিন।

কথিকা মিত্র (বয়স-৯)

পেলে

এক যে ছিল ছেলে,
নামটি তার পেলে।
রঙটি তার কালো,
খেলে খুব ভালো।
বলটি পায়ে পেলে,
গোলে দেয় ঠেলে।

রাজীব রায় (বয়স-১০)

চিঠি

(গ্রীষ্মের ছুটিতে সবাই যখন কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল, তখন নিয়ানদের উত্তরপ্রদেশের বাড়িতে বিরাট এক চুরি হয়ে যায়। সেই খবরে বাড়ির সবার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। ছ'-বছরের ছোট্ট মেয়ে নিয়ান তখন ঠাকুমাকে সান্ত্বনা দিয়ে এই চিঠিটা লিখেছিল।)

ঠাকুমা,

তুমি কেন মন খারাপ করছ? আমার মনে হয়, চোরেদের কোনো দোষ নেই। ওদের তো কিচ্ছু নেই, ওরা যদি শাড়ি-টাড়ি, গয়না-টয়না চুরি করে তাহলে কি দোষ হয়? মার তাক ভর্তি, ট্রাংক ভর্তি, বাবার আলমারি ভর্তি। তার থেকে চোরেরা একটু নিলে কী আর ক্ষতি হয়! তুমি দিদানি, স্নেহদি, গংগামাণিদি, কার্তিকদাদের বলে দিও যেন মন খারাপ না করে। চোরেরা ভাগ্যিস তোমার শাড়ি রেখে গেছে। তোমার তো কমই শাড়ি।

নিয়ান ঘোষ (বয়স—৫)

ছবি এঁকেছে **সোনাজিতা বন্দ্যোপাধ্যায়** (বয়স-৮)

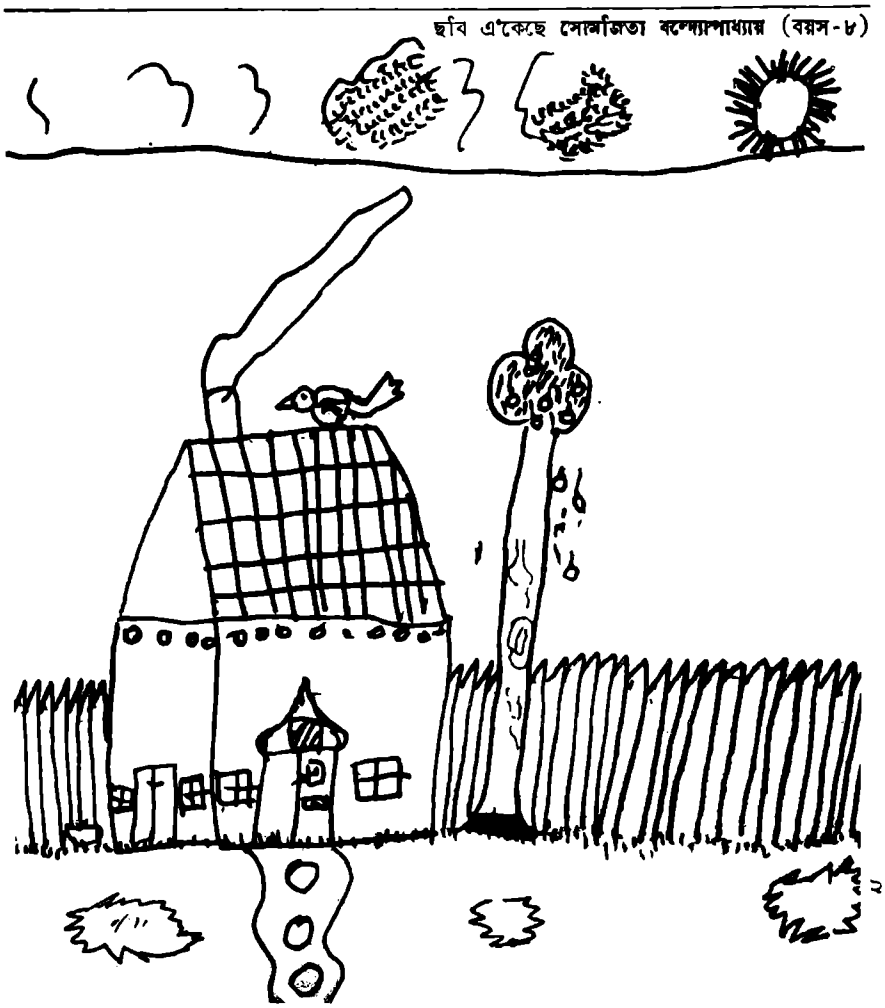

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

(এরপর ছাব্বিশের পাতায়)

মাসিক

আনন্দমেলার ছোট্ট বন্ধুদের প্রতি

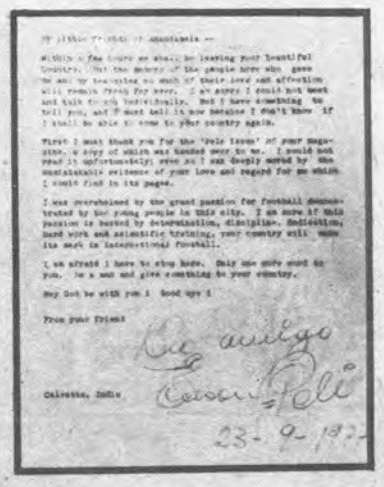

"আনন্দমেলা"-র ছোট্ট বন্ধুরা,

আর অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা তোমাদের সুন্দর দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কিন্তু আমার স্মৃতিতে চির-উজ্জ্বল থাকবে এখানকার জনগণের কথা, যারা তাদের স্নেহভালবাসার অনেকখানিই উজাড় করে দিয়েছে আমার আর আমার সহ-খেলোয়াড়দের উপর। ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এবং আলাপ করতে পারিনি, সেজন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু তোমাদের কিছু বলতে চাই। আর তা আমাকে এখনই বলতে হবে। কারণ, আর কখনও তোমাদের দেশে আসতে পারব কিনা জানি না।

প্রথমেই তোমাদের ধন্যবাদ জানাতে হয় তোমাদের পত্রিকার "পেলে সংখ্যা"-র জন্যে, যা আমাকে একটি দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ওটি আমি পড়তে পারিনি। তবুও ওর পাতায় পাতায় আমার প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার যে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেলাম তা গভীরভাবে আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে।

ফুটবলের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তির যে নিদর্শন এই মহানগরীর যুবসমাজ দেখাল, তাতে আমি অভিভূত হয়েছি। যদি এই আসক্তির সঙ্গে থাকে দৃঢ় সঙ্কল্প, শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম আর বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ তাহলে তোমাদের দেশ যে আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরে নিজের স্থান করে নেবে সে-সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।

এখানেই থামতে হচ্ছে। শুধু আর একটা কথা। মানুষ হও এবং দেশকে কিছু দাও।

ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন! বিদায়!

ইতি তোমাদেরই বন্ধু

পেলে

কলকাতা, ভারত

10

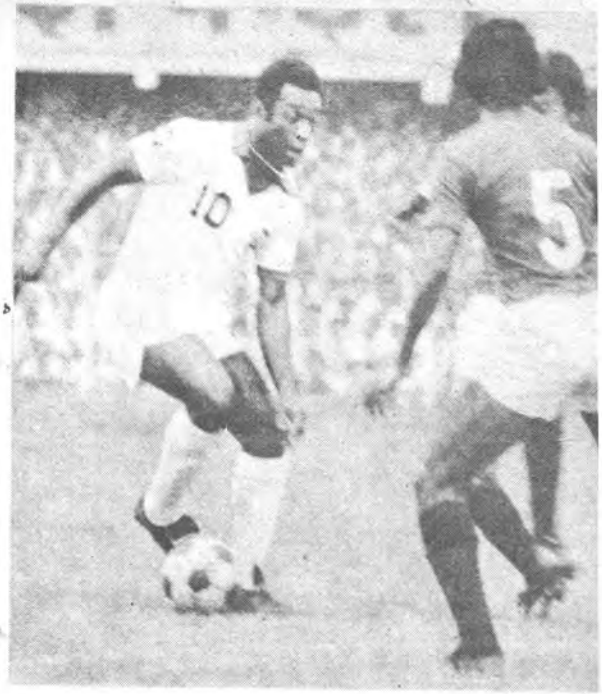
10
5

10

9

(তেইশের পাতার পর)

দানো দূরে সরে গেছে! কিন্তু তেল ফুরিয়ে আসছে!
তাড়াতাড়ি বৈঠা চালা!

টারজানের কথামতো ক্যাপ্টেন আমেদ জাহাজের খোলে ঢুকে জেনকে দেখতে পেল...
দানোটা কি আমাদের ধরে ফেলতে পারে?
তেল ফুরোলেই ও এসে হানা দেবে আবার!

জ্বলন্ত বস্তাগুলোকে ধর্!
ওগুলোকে কাছে টেনে আন্!
দানোটা তাহলে কাছে ঘেঁষবে না!
ছেড়ে দাও আমাকে!
এই করে বাঁচা যাবে না!

সরে যা!
আমাকে যেতে দে!

আমাকে জায়গা দে!
তারপর তাড়াতাড়ি নৌকো চালা!

ভিতরের খাঁড়ির দিকে এগো!
আগুনের বস্তা কাছে টেনে রাখ্!

ওরে বোকারা, দানোটা তোদের নৌকো উল্টে দেবে...

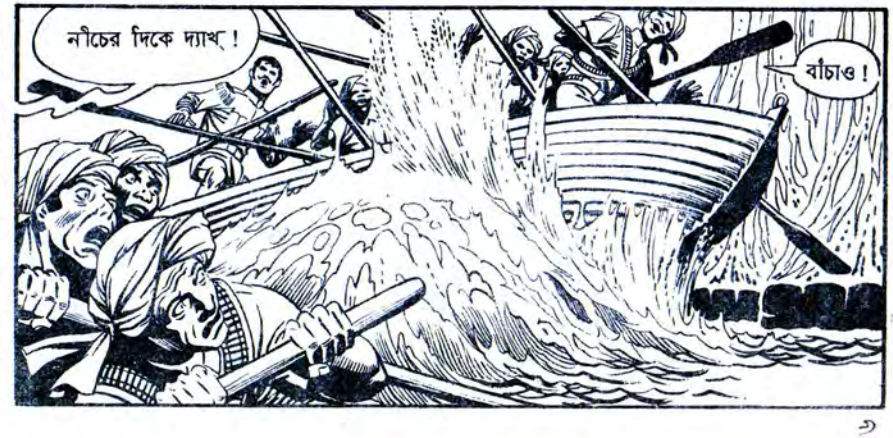
নীচের দিকে দ্যাখ্!
বাঁচাও!

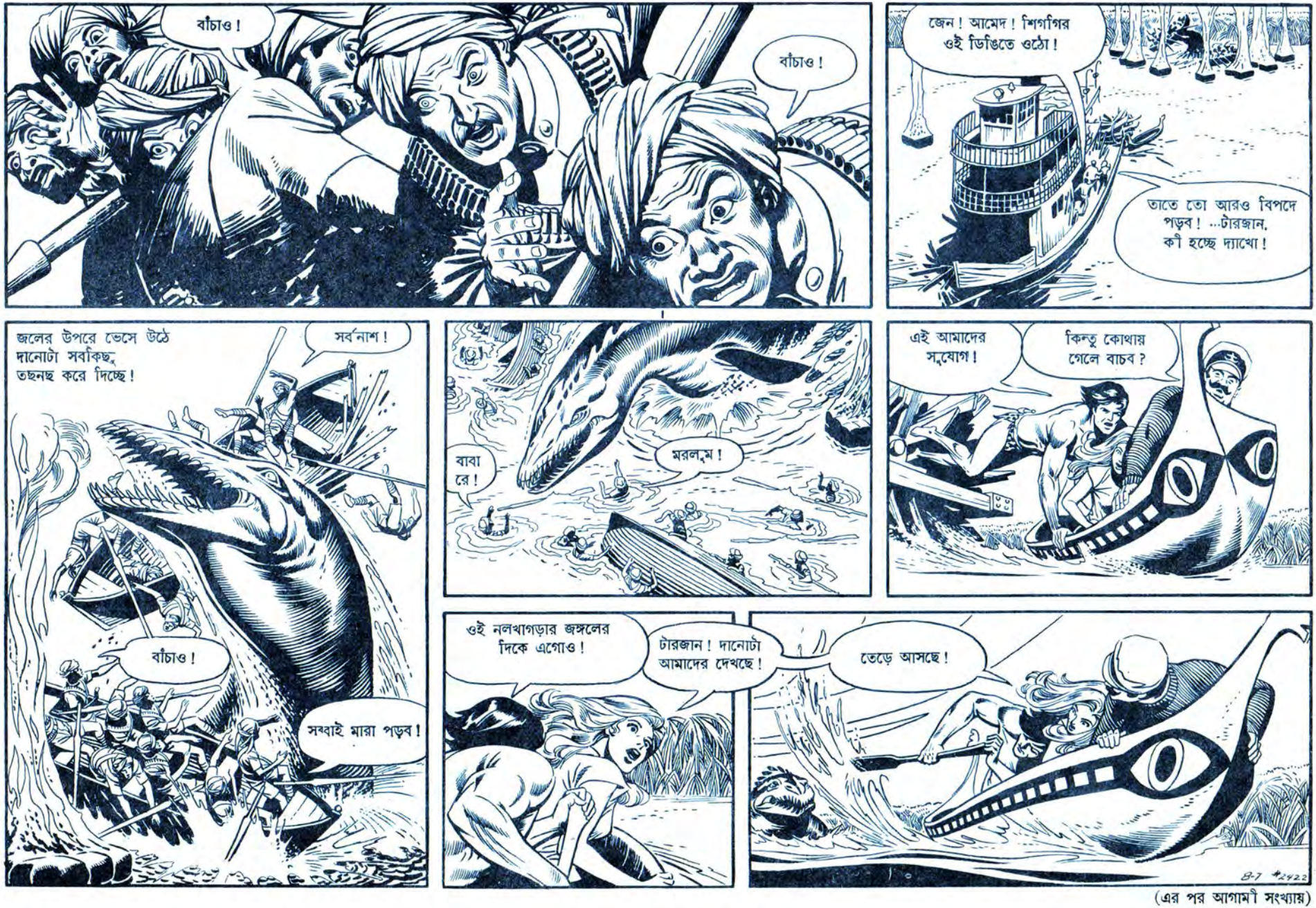

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

আটখানা

পুজোর আর ক'দিন মাত্র বাকি। এবারে আট টুকরো দিয়ে যেমন নক্‌শা তৈরি হয়েছে, তেমন নকশা পুজোর প্যাণ্ডেলে, বাড়িতে অনেকবার দেখতে পাবে। বিজয়াতে তো দেখতে পাবেই। এ হল সেই হাঁটু মুড়ে প্রণাম করার ভঙ্গি। তোমরা আগে যেমন পিচবোর্ড কেটে আমার দেখানো (একদম ওপরে দেখতে পাবে) আট টুকরোর ছক থেকে নানারকম ভঙ্গি করেছ, এবারেও পারবে। একটু শুধু চেষ্টা করতে হবে এই যা!

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গতবারের সমাধান

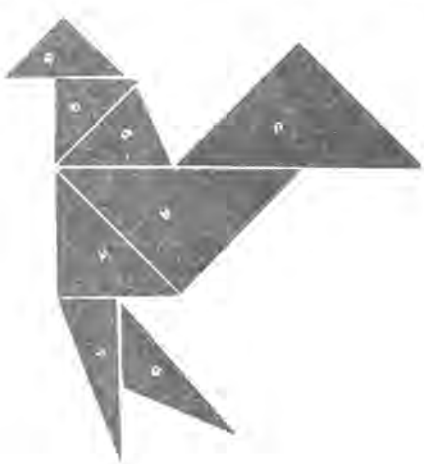

ধাঁধা

সীমামাসীর পুজো-বাজারের গল্প শুনে আমরা অবাক। একটু যে খরচে স্বভাব সীমামাসীর, তার পরিচয় আমরা অনেক পেয়েছি। সীমামাসীর সঙ্গে রাস্তায় বেরুলেই হল। এই ভিখিরিকে টাকা দিচ্ছে, এই দারোয়ানকে বখশিস দিচ্ছে, এই আমাদের আইসক্রীম খাওয়াচ্ছে—খরচের আর অন্ত নেই।

তবে এবারে নাকি পুজো-বাজারে বেরিয়ে সীমামাসী সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরেছে। তাও আসল কেনাকাটা নয়, টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস। "ভাগ্যিস গাড়িটা ছিল, তাই ফিরতে অসুবিধে হয়নি। নইলে ফিরতেই পারতুম না। মা তারা, মা গো..." সীমামাসীর হাত বারবার কপালে ঠেকে।

ছোট্‌কার যা স্বভাব। এই নিয়ে সীমামাসীকে খানিকটা খেপাল। তারপর আমাকে বলল, "সতুবাবু, চমৎকার একটা ধাঁধা বানানো যায় সীমামাসীর এই বাজার করা নিয়ে।"

"কী রকম?" আমি তক্ষুনি খাতা-পেনসিল নিয়ে বসে যাই। ছোট্‌কা বলতে থাকে :

প্রত্যেক দোকানে ঢোকার সময় ভিখিরিকে এক টাকা দিয়েছে সীমামাসী, বেরুবার সময় দারোয়ানকে এক টাকা বখশিস। এইভাবে প্রথম দোকানে ঢোকার সময় এক টাকা ভিখিরিকে দিয়ে ঢুকল সীমামাসী, তারপর হাতের টাকার ঠিক অর্ধেক টাকা খরচ করে জিনিস কিনল। বেরুবার সময় দারোয়ানকে এক টাকা দিল। আবার দ্বিতীয় দোকানে ঢোকার সময় ভিখিরিকে দিল এক টাকা। হাতের বাকি টাকার অর্ধেক খরচ করল দোকানে। বেরুবার সময় দারোয়ানকে বখশিস দিল একটা টাকা। তৃতীয় দোকানে ঢোকার মুখেও তাই। এক টাকা ভিখিরি। ফের হাতের টাকার অর্ধেক দোকানে খরচ, বেরুবার মুখে দারোয়ানকে এক টাকা। চতুর্থ দোকানে ঢোকার সময় আবার ভিখিরিকে এক টাকা, দোকানে হাতের অবশিষ্ট টাকার অর্ধেক টাকায় কেনা-কাটা সারা, বেরুবার সময় দারোয়ানকে এক টাকা বখশিস।

চতুর্থ দোকান থেকে বেরিয়ে সীমামাসী অবাক। হাতে একটাও টাকা আর নেই

এবার বলো তো, কত টাক কাটা করতে গিয়েছিল সীমাম

প্রথম ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ ২৪ লিটার দুধ। সঙ্গে দুটি ছোট খালি পা অন্যটি ৫ লিটারের। কয়েকবা ঢালাঢালি করে দোকানদার দু- করে দুধ দিব্যি ভাগ করে দি সাহায্য লাগল না। কী করে

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ সং যোগ দিলে সংখ্যাটি একদম

চতুর্থ ধাঁধা ॥ বছরের ক রয়েছে?

গতবারের উত্তর ॥

(১) দুটি ছোটখাট চেহ কমলা শমিতা আর বুলনের ম কমলার সঙ্গে শমিতার কথা শমিতার মধ্যে একজন আর বু হওয়া দরকার। বুলন শাড়ি প জনের একজন ম্যাক্সি, অন্য ম্যাক্সি-পরা নমিতা-শমিতা ওদিক থেকে কমলাকে নি পোশাকের তিনজনকে গল্প অসুবিধে হয় না। কেননা কম কামিজ। অতএব এক টেবিলে

আরেকটি টেবিলে তাহলে

ভাব নেই অথচ একরকম নিঃসন্দেহে দোলন ও বুলন।

(২) দুধের গ্লাসে জলের গ্লাসে দুধের পরিমাণ সমান।

(৩) ৬৩

(৪) ৭২ সংখ্যাটি বেমানা প্রত্যেকটি ঘনফল।

সত্যসন্ধ

ছবি অহিভূষণ মালিক

মজা-রহস্য

ার নেই।
কত টাকা নিয়ে টুকিটাকি কেনা-
ন সীমামাসী ? এটাই এবারের

৪ লিটারের একটা বড় পাত্রে ভর্তি
খালি পাত্র। একটি ১১ লিটারের.
কয়েকবার এ-পাত্র থেকে ও-পাত্রে
দার দু-জন খদ্দেরকে ১২ লিটার
করে দিল। অন্য কোনও কিছুর
ী করে সম্ভব হল?
কান্ সংখ্যাকে দ্বিগুণ করে দুই
একদম উলটে যাবে?
রের কটা মাসে তিরিশ দিন

াটে চেহারার মেয়ে হতে পারে
ুলনের মধ্যে যে-কোনও দু-জন।
র কথা বন্ধ। সুতরাং কমলা-
আর বুলন। তিন রকম পোশাক
শাড়ি পরেছে, সুতরাং বাকি দু-
য়, অন্যজন শালোয়ার-কামিজ।
মতা মধ্যে নমিতাকে নিলে
নিজে পারা যায়। তাহলে তিন
গল্প-করা অবস্থায় পেতে
ন্দনা, কমলার পরনে শালোয়ার-
টেবিলে বুলন, কমলা ও নমিতা।
তাহলে অমলা ও শমিতা।
একরকম পোশাক, এ মেয়ে দুটি
বুলন।
স জলের পরিমাণ ও জলের
সমান।

ট বেমানান। অন্য সংখ্যাগুলি

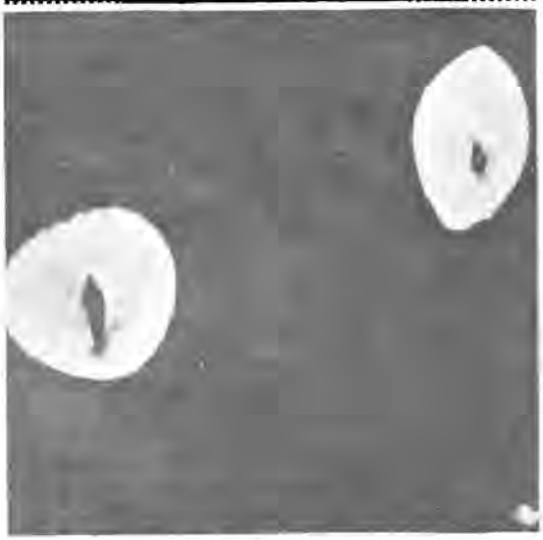

কিসের ফটো

উত্তর আগামী সংখ্যায়/ফটো : তপন দাশ

গতবারে ছিল জ্বলন্ত ইলেকট্রিক বাল্বের ফটো

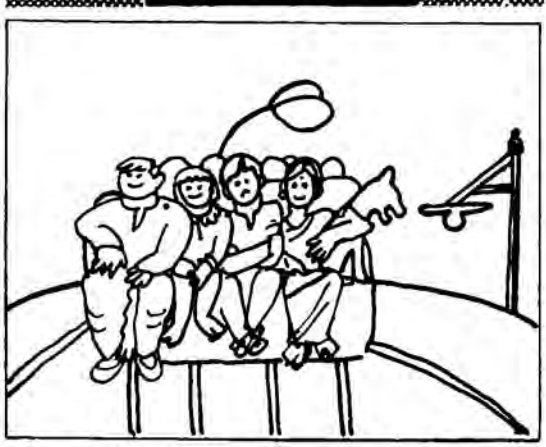

কিসের ছবি

এ মাসটা উৎসবের মাস। ছোট থেকে বড় সবার মধ্যেই আনন্দের ফোয়ারা বয়ে চলেছে সমানে। এবারের এই ছবিটাও বেশ মজার ছবি। এখানে ছোট বড় সবাই খোশমেজাজে বসে। ছবিটা হঠাৎ দেখলে কী মনে হতে পারে বলো তো! অনেকে মিলে বসেছে ছবি তোলাবার জন্যে? যদি তাই হয়, তবে পেছনের লাইনটা অমন বেঁকে গেছে কেন? ছাত বা বারান্দা নিশ্চয়ই এমন দেখতে নয়। নাগরদোলায়? না, নাগরদোলা অত চওড়া হয় না। সমস্ত রহস্য কিন্তু পেছনের বাঁকানো লাইনটাতেই রয়ে গেছে। আসলে এরা সবাই বসে আছে চিড়িয়াখানার হাতির পিঠে। হাতিটা কত উঁচু, পেছনের ল্যাম্প পোস্টটা দেখলেই বুঝতে পারবে। আর হাতি কোন্ দিকে চলেছে তা বুঝতে পারবে বেলুনগুলো কোন্ দিকে উড়ছে লক্ষ করলে। সামনে হাতির পিঠে বসার জায়গা, বিস্তর দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা রয়েছে।

চিত্রপাল

শব্দ-সন্ধান

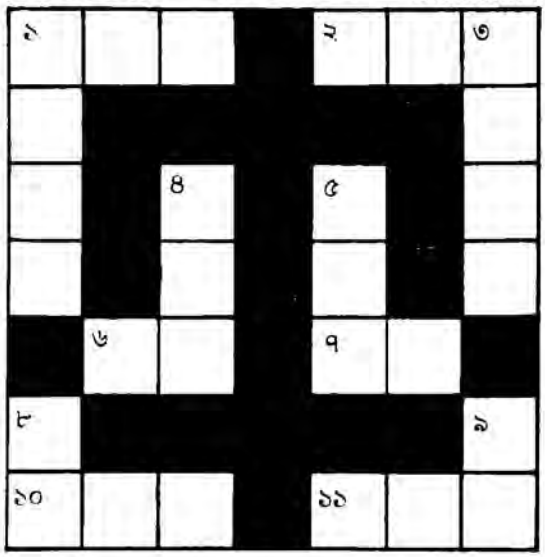

আগে একবার ফুল নিয়ে শব্দ-সন্ধান দেওয়া হয়েছিল, এবারে একটু 'ফলাহার' করে দেখ। পুরাণে অর্ধভোজন গোছের ব্যাপার আর-কি!

সংকেত : পাশাপাশি : (১) কোন্ ফলের মেয়ে অতীতের নামকরা গায়িকা ? (২) এই নামে অচেনা মনে হলেও খুবই চেনা ফল—নুন লাগিয়ে খেতে মজা। (৬) ছোট ফল, কিন্তু সঙ্গে বাটি থাকলে বড় হয়ে যায়। (৭) কোন্ ফল অপ্সরা? (১০) গাছের রসও সুস্বাদু—ফলের মতোই। (১১) এর আমসত্ত্ব সোনার পাথরবাটির কথা মনে করিয়ে দেয়।

উপর-নীচে : (১) ফলের আবার চোখ আছে—তা-ও অনেকগুলো। (৩) কোন ফলের পাঁচটি শিরা ?। (৪) ফল ভাঙলেই থরে-থরে অনেক দানা। (৫) উলটে নিলে অমৃতফল, আবার তার গাছও। (৮) কোন গাছ নিজেই ফল— মানে পুজো-অর্চনায় পাঁচরকম ফলের দলে ভিড়ে যায় ? (৯) কাঁচাতে জল, পাকলে ক্ষীর—তবে খাওয়ায় অনেক ঝক্কি!

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গতবারের সমাধান

১ ভূ	২ পা	ল	■	৩ শি	৪ ল	ং
■	ট	■	৫ হা	■	খ	■
■	না	■	য়	■	নৌ	■
৬ ত্রি	■	৭ মা	দ্রা	জ	■	৮ আ
বা	■	■	বা	■	■	ই
ন্দ্র	■	■	দ	■	■	জ
৯ ম	সি	লা	■	১০ ই	ক্ষ	ল

আপনিই মিঃ অ্যারিস্টাইডিস সিল্‌ক?
হ্যাঁ।

আপনাকে আমি গ্রেফতার করলুম।
গ্রেফতার? আমাকে?

হ্যাঁ, আপনাকে! আপনি একটি চোর!
আমি চোর? আমি হচ্ছি একজন রিটায়ার্ড সরকারী অফিসার!

তাহলে, মিঃ সিল্‌ক, এ-সবের অর্থ কী?

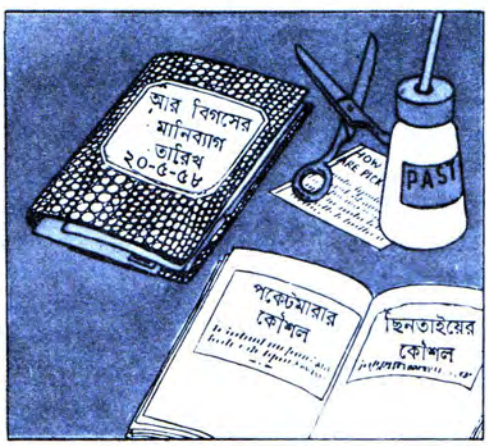
আর বিগসের মানিব্যাগ তারিখ ২০-৫-৫৮
PASTE
পকেটমারার কৌশল
ছিনতাইয়ের কৌশল

মানে...আমি ঠিক পকেটমার নই...এ হচ্ছে আমার একটা রোগ...মানে মালিকের নাম লিখে, তারিখ লিখে, সব একেবারে বর্ণানুক্রমিকভাবে আমি সাজিয়ে রাখি...আর...

এই হচ্ছে আমার সংগ্রহ...

বিশ্বাস করুন, ভদ্রমহোদয়েরা, এমন সংগ্রহ পৃথিবীতে আর কারও নেই। অথচ, মাত্র তিন মাসে আমি এই বিপুল সংগ্রহ গড়ে তুলেছি।
আশ্চর্য! সবই যে দেখছি সত্যি-সত্যি একেবারে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো।

কে জানে, ম্যাক্স বার্ডের মানিব্যাগটাও এখানে মিলবে কিনা...

হুর্‌রে! পেয়েছি!

ম্যাক্স বার্ডের মানিব্যাগ তারিখ ১-৫-৫৮

আর এই হচ্ছে দুই চিরকুট! তবে তো লাল বোম্বেটের গুপ্তধন আমরা পাবই!

(এরপর চৌত্রিশের পাতায়)

বরাহনগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

উদ্যোগী বাঙালী ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের নামেই স্কুলের নাম—বরাহনগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির। প্রধান শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী বললেন, "ঢাকা নবাবগঞ্জ স্কুল ছেড়ে এদেশে আসি অনেক আশা নিয়েই। আমাদের কাজ আমরা ঠিক ভাবেই করে যাচ্ছি। এখানে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক খুবই মধুর। আমাদের ছেলেরা পর পর দুবার পূর্বভারতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে (নেহরু মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত) ফার্স্ট হয়েছে। দিল্লিতে জাতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে আমন্ত্রিত হয়েছি আমরা গতবারের মত এবারও।"

লেখাপড়ার ফলও ভাল। প্রায় প্রত্যেকবারই শতকরা ১০০ জন পাশ করে। ন্যাশনাল স্কলারশিপ অনেকবারই এসেছে। এবং একবার দুজন স্ট্যান্ডও করেছে। "আমাদের স্কুলে প্রথম পনের বছর ইংরেজিতে কেউ ফেল করেনি—বেশ ভাল ভাল নম্বর পেয়ে পাস করেছে। শতকরা ৬০—৭০ নম্বর অনেক ছেলেই পায়।"

চমকে উঠলাম। বাইশ বছর বয়েসের স্কুলের পক্ষে (প্রতিষ্ঠা ১৯৫৫) এটা তো দারুণ কৃতিত্ব! রহস্যটা জানতে চাইলাম সঙ্গে সঙ্গেই।

"আমাদের স্কুলে ইংরেজির সব শিক্ষকই ইংরেজি শিক্ষণে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। প্রাপ্ত শিক্ষা অনুযায়ী তাঁরা "ডাইরেকট" পদ্ধতিতে পড়ান। বাংলা-ইংরেজি মেশানো 'ট্রানস্লেশন' পদ্ধতিতে ছাত্রদের আপাতদৃষ্টিতে সুবিধা হয় সত্যি, কিন্তু ওতে সাবলীলতা আসে না।"

সাধারণ ছেলেদের সম্পর্কে উনি বললেন, "ছোটবেলা থেকে ইংরেজির ভিত শক্ত না করলে পরে অসুবিধেয় পড়তে হয়। কারণ, যতো উঁচু ক্লাস আসবে, ততো অন্য সাবজেক্টের চাপ বাড়বে। তবে ছোট ছোট সেন্টেন্স লেখা থেকে শুরু করে নিজে বেশি করে লেখা অভ্যাস করা, টেক্সট বই ভাল করে পড়া, ওয়ার্ক বুক অভ্যাস করা—এসব কথা নতুন করে আর বলার কী আছে? গ্রামার পড়লে একদিকে যেমন ইংরেজির বুনিয়াদ শক্ত হবে অপরদিকে তেমনি গ্রামারেই অল্প খেটে বেশি মার্কস উঠবে। এই এক ঢিলে দুই পাখি মারার সুযোগ সত্ত্বেও কেন যে ছেলেরা গ্রামারকে অবহেলা করে সেটাই তো রহস্য!"

কৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, এবার যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী ফেল করেছে তার মূলেও কি ইংরেজি?

উনি বললেন, "বিশেষ কোনো সাবজেক্ট নয়, গোটা নতুন ব্যবস্থার সঙ্গেই এখনও খাপ খাইয়ে নিতে পারা যায়নি। তা ছাড়া, অনেকেরই আশঙ্কা, কর্মশিক্ষা-শারীরশিক্ষা পেপারটিতে সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিয়েছেন ওই বিষয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। এমনও দেখা গেছে, যে ইংরেজিতে ৭৪ পেয়েছে, সে কর্মশিক্ষার পেপারে ৬২/৬৩-র বেশি পেল না।

বাংলা সম্পর্কে শ্রীচক্রবর্তীর বক্তব্য—ইংরেজি ছাড়া আর সব বিষয়ের উত্তর যখন অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বাংলাতেই লিখবে, তখন বিষয়টিতে খুবই জোর দেওয়া উচিত। আর সব জিনিস সমান থাকলে যার ভাষা ভাল সে-ই তো বেশি নম্বর পাবে। বাংলাতেও লেখার অভ্যাস করা চাই। ব্যাকরণভীতি দূর করতে হবে। বানান ভুল, সাধু-চলিতের মিশ্রণ—এসব বর্জন করতে হবে। লেখার মাঝে একটি ভাব বিশেষ এক জায়গায় আটকে গিয়ে যেন বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি না হয়।

অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় শ্রীচক্রবর্তী ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকরা অনেক কিছু বললেন। তাঁরা হলেন: শ্রীঅমিয়রঞ্জন সামন্ত (ফিজিক্যাল সায়েন্স), শ্রীশ্যামসুন্দর জানা (লাইফ সায়েন্স), মহঃ তৌহির আলি (ভূগোল) ও শ্রীঅমিয়-কুমার রিক্ (ইতিহাস)। ফিজিক্যাল সায়েন্সে ভাল নম্বরের জন্যে শ্রী সামন্ত তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিলেন। ইউনিট উল্লেখ করতে হবে সঠিকভাবে। সংজ্ঞা শুধু মুখস্থ লিখলেই চলবে না, সেটাকে স্পষ্ট করে বোঝানো চাই। আর, আজকাল প্রশ্নের যে ছোট ছোট অংশ থাকে সেগুলির উত্তরও যে আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া হচ্ছে তা বোঝানোর জন্যে উত্তরের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কিছুটা ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে। অন্যথায় পরীক্ষক ধারণা করবেন যে না বুঝে 'টেনে মুখস্থ' লিখেছে!

অঙ্ক সম্পর্কে শ্রী সামন্ত বললেন: নতুন সিলেবাসের চাহিদা অনুযায়ী বই তেমন লেখা হয়নি। হায়ার সেকেন্ডারির বইগুলোকেই উলটে পালটে হাজির করা হয়েছে। সঠিক বই নির্বাচন করতে হবে। যেমন ধরুন, জ্যামিতিতে আজকাল অঙ্কনের উপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছে। বইতে থাক আর না থাক, ছাত্রকেও সেইভাবেই তৈরি হতে হবে। আর একটা কথা: অঙ্কে ভাল নম্বর তুলতে গেলে অবজেকটিভ অংশে পুরো নম্বর তুলতেই হবে। তার জন্যে বইয়ের সূচনায় যে জিনিসগুলো দেওয়া থাকে সেগুলো ভাল করে পড়তে হবে। "সুদকষে অঙ্ক করতে পারব, অথচ 'শতকরা' কথাটার মানে কী, তা বলতে

পারব না—এটা কি ঠিক?" আর, অঙ্ক যে প্রতিদিন অভ্যাস করতে হবে, এ-কথা সকলেই মানবে।

ভূগোল প্রসঙ্গে আলোচনায় ও'রা সকলেই একমত যে "ভূগোলের প্রাকৃতিক অংশটিকে সিলেবাস থেকে নির্বাসিত করে সর্বনাশ করা হয়েছে। পদে পদে 'অক্ষাংশ', 'দ্রাঘিমাংশ', 'মহীঢাল', 'হিমানী সম্প্রপাত'—এসব শব্দ ব্যবহার করতে হবে, অথচ সেগুলো কী তা ছেলেদের পড়ানোর ব্যবস্থা নেই!" ম্যাপ, চার্ট ও ডায়াগ্রামভিত্তিক পড়াশোনা হওয়া চাই। স্কুলের পাঠ্য-তালিকার ওয়ার্কবুক ছাড়াও প্রত্যেক ছাত্রের একটা নিজস্ব নোট বুক থাকা খুবই দরকার। "আর, বছরে অন্তত দুবার শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা থাকা চাই, যাতে ছাত্ররা তাদের পঠিত বিষয়ের সঙ্গে বাইরের জগৎটাকে মিলিয়ে নিতে পারে," বললেন শ্রী আলি। তেমনি ইতিহাসেও জোর দিতে হবে প্রকাশ-ভঙ্গির উপর। উপযুক্ত উৎস থেকে কিছু উদ্ধৃতি উত্তরে দিতে পারলে খুব ভাল হয়। ইতিহাস সব সময়ে 'পয়েন্ট করে' পড়া উচিত। জীবন-বিজ্ঞানে ল্যাবরেটরির ব্যবহার আর 'ফিল্ড নোট বুক' রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন নরেন্দ্রনাথ বিদ্যা-মন্দিরের প্রধান শিক্ষক ও শ্রী জানা।

কী ভাবে তৈরী হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দিরের ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় যশোজীবন। ওর বাবা শ্রীযোগেশ-চন্দ্র বণিক ওই স্কুলেরই শিক্ষক। ডাক্তার এঞ্জিনীয়র—এসব হওয়ার দিকে ঝোঁক যশোজীবনের নেই। ও হতে চায় শিক্ষা-ব্রতী। কে জানে এটা ওর বাবা ও দাদুর প্রভাবে কি না! দাদু ছিলেন নেত্রকোণা কলেজের অধ্যক্ষ।

সোদপুরের দেশবন্ধুনগর থেকে প্রতি-দিন বাসে বরাহনগর যাতায়াত করাটাকে এই রোগা ছেলেটি কষ্ট বলে মনেই করে না। শিশু শ্রেণী থেকেই তো এই করছে। ফার্স্ট হচ্ছে অবশ্য এইট থেকে।

"ফাইনালে ফল ভাল করতে পারবে?"

"চেষ্টা তো করছি।"

"কতক্ষণ পড়ো?"

"সকালে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা, রাতে ঘণ্টা চারেক। স্কুল না থাকলে ও পরীক্ষার আগে আরও তিন বা সাড়ে তিন ঘণ্টা।"

"পড়ো কীভাবে?"

"যে কোনও সাবজেক্টেই প্রথমে স্কুলের পাঠ্য বই বা অন্য কোনও ভাল বই ভাল করে রিডিং পড়ে নিই। তারপর রেফারেন্স বইগুলো। কোন্ বইয়ে কী নতুন পয়েন্ট পেলাম নোট করি। এই রকম করে ক্লাসে যে-সব প্রশ্ন বলা হয় সেগুলোর উত্তর তৈরি করি।"

ইংরেজি ও বাংলায় যশোজীবন টেক্সট খুঁটিয়ে পড়ে। কঠিন শব্দগুলোর মানে শিখে নেয়। সমার্থক-বিপরীতার্থক শব্দ, বা ব্যাকরণগত টীকা শেখে। তারপর সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে।

পড়াশোনায় বাবা যে ওকে সাহায্য করেন তা বলাই বাহুল্য। একজন গৃহ-শিক্ষকও আছেন। যশোজীবন জানাল, মাসিক আনন্দমেলাও ওকে কম সাহায্য করে না। লেখাপড়া ও কারিগরি বিভাগ দুটি ওর বিশেষ প্রিয়। আর "প্রধান পরীক্ষকের উপদেশ" যেটা পুজো সংখ্যায় বেরোয়। "ওটার মধ্যে আবার বিশেষ বিশেষ জায়গায় বাবা দাগ দিয়ে দেন।"

বাইরের বই যশোজীবন প্রচুর পড়ে। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা উঠে গেলেও ওই কোর্সের ভাল বইগুলির উপযুক্ত ব্যবহার করে ও। স্কুলে পি আচার্যের রচনা ও সুনীতিকুমারের ব্যাকরণ পড়ানো হয়। তার উপর ও পড়ে সুরেন নিয়োগীর (হাঃ সেঃ) বই এবং সাহা-বসু। আর জগদীশ ঘোষের ব্যাকরণ। ইংরেজিতে পাঠ্য পি কে দে সরকারের বই ছাড়া উইলফ্রেড ডি বেস্ট-এর স্টুডেন্টস কম্পানিয়ন, রেন-মার্টিন এবং আর সি চৌধুরী। সংস্কৃতে বুকলিস্টের বই হেল্পস্ টু দি স্টাডি আর সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের নব কলেবরে ব্যাকরণ কৌমুদী ছাড়া পড়ে ভুজঙ্গভূষণবাবুর ব্যাকরণ কৌমুদী এবং কৃষ্ণগোপাল গোস্বামীর দুটি পুরোনো কোর্সের বই—সংস্কৃতের দ্বিধারা, নবরূপে ব্যাকরণ কৌমুদী। ইতিহাসে নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ভারত কথা'-র সঙ্গে ডঃ অতুল রায়, ডঃ কিরণ চৌধুরী এবং প্রেমবল্লভ-প্রণয়বল্লভ সেনদের বই। প্রণয়বল্লভ সেনের "মানচিত্রে রাজনৈতিক" ও ব্যবহার করে। সেইরকম ভূগোলেও লাহিড়ী-সেনগুপ্তের পাশা-পাশি ভট্টাচার্য-বসু, বসু-ভট্টাচার্য, পশু-পতি চট্টোপাধ্যায় এবং দুটি প্রশ্নোত্তরের বই যশোজীবন পড়ে।

"অঙ্ক ক'খানা বই থেকে করো?"

উত্তরে ও বলল, ক্লাসে নরেশচন্দ্র সমাজপতির বই আর রায়চৌধুরী-সরকারের জ্যামিতির বই পড়ানো হয়। এছাড়া ব্যবহার করে কেশব নাগের 'কোর গণিত', মনো-মোহন রায়চৌধুরী, যাদব চক্রবর্তী এবং আরও দু'একটা বই। টেস্ট-পেপার থেকে নিয়মিত অঙ্ক অভ্যাস করে। ওর অতিরিক্ত বিষয়ও অঙ্ক। ফিজিক্যাল সায়েন্সে নামকরা সব বই—সমর গুহ, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, চিত্ত মিত্র, শ্রীপতি দে, পি কে দত্ত—যশো-জীবন পড়ে। স্কুলের বই দে-ত্রিপাঠী। তেমনি লাইফ সায়েন্সে কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু ছাড়াও তারকমোহন দাস, হরিদাস গুপ্ত আর সলিল ভট্টাচার্যের বই।

খেলাধুলোর মধ্যে যশোজীবনের সব-চেয়ে প্রিয় ক্রিকেট। তবে ও ফুটবলও খেলে। ইনডোরে দাবা ও ক্যারম। আনন্দ-মেলা ছাড়াও অন্যান্য কিছু পত্রিকা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি পড়ে। ওর সবচেয়ে প্রিয় লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যশো-জীবন নিজেও একটু আধটু লেখার চর্চা করে। রবীন্দ্রসঙ্গীতও শেখে, তবে এ-বছরটা বন্ধ আছে।

একটা কথা যশোজীবন আমাকে বলেনি, প্রধান শিক্ষক মশায় বলে দিলেন। ছবি আঁকায় ওর দারুণ হাত।

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

ফটো—তপন দাস ৩৩

(একত্রিশের পাতার পর)

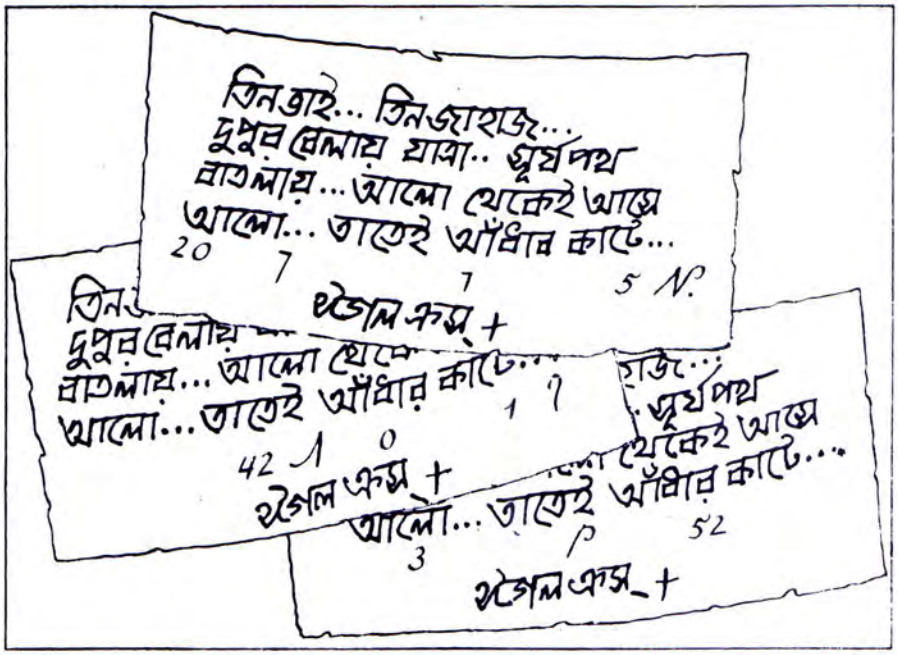

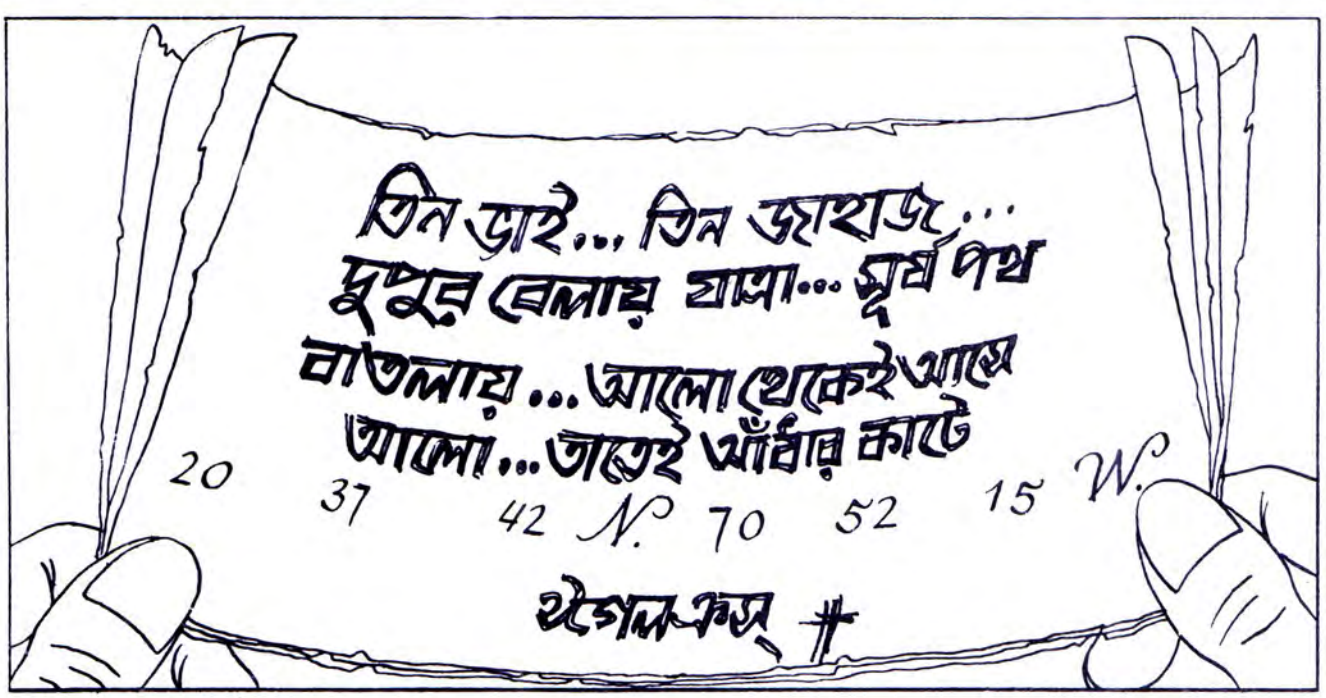

দ্রাঘিমা আর অক্ষরেখার নিশানা!
তার থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, জাহাজটা কোথায় ডুবেছিল!
তাহলে রওনা হচ্ছি কবে?
সেটাই হচ্ছে কথা!
প্রথমে একটা জাহাজ চাই! আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন চেস্টারের একটা ট্রলার আছে, সেটা ভাড়া নিতে পারি! তারপর চাই মাঝিমাল্লা, ডুবুরীর পোশাক, অন্যান্য সরঞ্জাম! তা এসব জোগাড় করতে মাসখানেক তো লাগবেই!
তারপরেই আমরা যাব গুপ্তধনের সন্ধানে!
তোমরা সবাই বুঝি আনন্দমেলা পড়ো? তাহলে তৈরি থাকো, সামনের মাস থেকেই বেরুচ্ছে আমাদের নতুন অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী
লাল বোম্বেটের গুপ্তধন

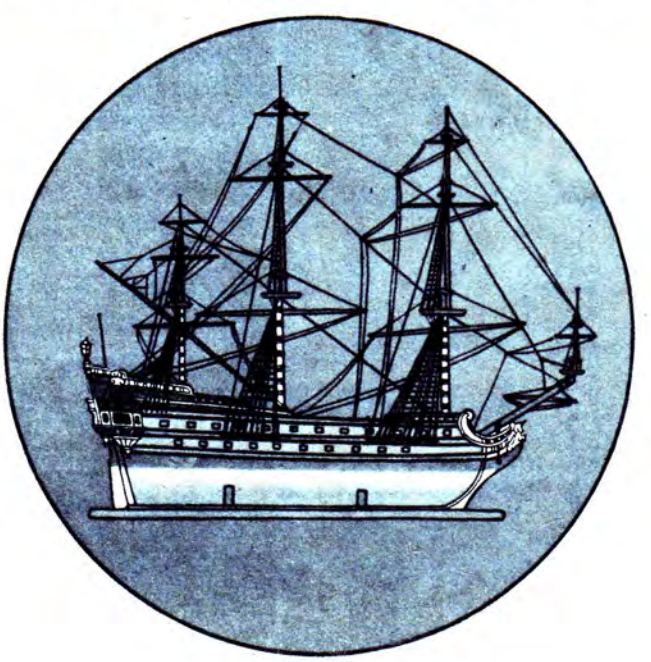

অলৌকিক

বিমল কর

আগে যা ঘটেছে

বরদা আর তার বন্ধুর একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবার কথা ছিল। বন্ধু মানিক এসে পৌঁছতে পারেনি। বরদা একাই বসে ছিল সিনেমায়। তার পাশে এসে বসল অচেনা এক ভদ্রলোক। সিটে বসে-বসেই লোকটা কখন যেন মরে গেল। সিনেমা ভাঙার পর বরদা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। নীচে মানিকের সঙ্গে দেখা। মানিক তাকে যেতে দিল না। সামান্য পরে দেখা গেল, মরা লোক জ্যান্ত হয়ে দিব্যি চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। বরদা আর মানিক ছুটে গিয়ে তাকে ধরল।

এই অদ্ভুত মানুষটির নাম সিদ্ধেশ্বর। আলাপ করার পর তিনি বরদাদের তাঁর বাড়িতে আসতে বললেন পরের দিন বিকেলে।

সিদ্ধেশ্বরের সদর স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে বরদারা জানল, ভদ্রলোক এক গবেষণার কাজ নিয়ে রয়েছেন। কোনো কোনো মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস্য, অলৌকিক এক শক্তি থাকে। সেটা কেমন করে হয়—এই তাঁর গবেষণার কাজ। অবশ্য এই সব গবেষণা এখানকার বাড়িতে হয় না—বাইরে দুমকার দিকে একটা সেন্টার আছে, সেখানেই হয়।

বরদারা ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। বিশ্বাসও হচ্ছিল না। সিদ্ধেশ্বর যেন তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করতে বাড়ির একজনকে দিয়ে একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়ে দেখালেন। তারপর—

৩

সদর স্ট্রীটের বাড়ি থেকে উঠতে উঠতে রাত হল। সিদ্ধেশ্বর বললেন, "চলুন, এগিয়ে দিয়ে আসি আপনাদের। এই রাস্তাটা ভাল নয়।"

যা ভাবা গিয়েছিল তা নয়; সিদ্ধেশ্বর কোনো ভেলকিঅলা নন, তুচ্ছ বা অবজ্ঞা করার মতন মানুষ নন। ভদ্র, মার্জিত, বুদ্ধিমান মানুষ। কথা বলতে পারেন চমৎকার। তাঁর কথা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যেতে হয়, ভালও লাগে। অনেক গল্প করলেন তিনি। নিজের জীবনের কথাও বললেন সামান্য। কলকাতায় জন্ম, বাবা ছিলেন রেলের এঞ্জিনিয়ার, ছেলেবেলায় বিস্তর ঘুরেছেন বাবার সঙ্গে, বদলির চাকরি ছিল বাবার। মা একেবারে মাটির মানুষ। ধর্মকর্মে মায়ের বাতিক ছিল খুব। গোরখপুরে থাকার সময় এক সাধুজী মায়ের কাছে খুব আসতেন, তিনি ছিলেন সূর্যপূজারী। সিদ্ধেশ্বর ছেলেবেলায় দেখেছেন, সাধুজী সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কখনও কোনো ছায়ার তলায় দাঁড়াতেন না, অন্নজল গ্রহণ করতেন না, সারাক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মেঘ-বাদলের দিনেও তাঁকে ঘরে ঢোকানো যেত না। এই সাধুজী বড় অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। সাধকপুরুষ। তিনি এমন অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেতেন আচমকা, যা কোনো মানুষই দেখতে পায় না। সাধুজী বাবাকে বলেছিলেন, বাবা ব্রিজ তৈরির কাজ করতে গিয়ে রেল অ্যাকসিডেন্টে মারা যাবেন। বাবা সেই ভাবেই মারা যান।

সাধুজী নিজের এই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিকে বলতেন অভিশাপ। কেমন করে এটা তাঁর মধ্যে এসেছিল জানেন না। এই জ্ঞান তাঁকে যন্ত্রণা দিত। তিনি নিজে গঙ্গায় ডুবে মারা যান। বোধ হয় আত্মহত্যা করেছিলেন।

সিদ্ধেশ্বর বাবার মতন এঞ্জিনিয়ার না হয়ে ডাক্তার হবার শখ নিয়ে মেডিক্যাল পড়তে ঢোকেন। বছর তিন-চার পড়ার পর ছেড়ে দেন। তারপর টোটো করে বেড়িয়েছেন নানা জায়গায়, ছোটখাট কাজকর্মও করেছেন। শেষে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল নৈনিতাল বেড়াতে গিয়ে। তিনি মানুষের অস্বাভাবিক মানসিক ও শারীরিক শক্তি নিয়ে গবেষণা করছেন অনেক দিন ধরে। সেই ভদ্রলোকই পরে সিদ্ধেশ্বরকে নিজের কাছে টেনে আনলেন। তখন থেকেই সিদ্ধেশ্বর তাঁর সঙ্গে। ভদ্রলোকের বয়েস হয়ে গেছে অনেক, সিদ্ধেশ্বরকেই হাজার রকম জিনিস দেখাশোনা করতে হয়।

বরদা জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের সেই জায়গাটা কোথায়?"

সিদ্ধেশ্বর জায়গার নাম বললেন। বরদা জীবনেও নাম শোনেনি অমন জায়গার। বলল, "কোথায় সেটা?"

"দুমকার কাছেই। মাইল কয়েক দূর।"

"কী নাম?"

"পি পি রিসার্চ সেন্টার।"

"মানে?"

"প্যারাসাইকিক ফেনামেনন রিসার্চ সেন্টার। নামটায় সব বোঝায় না, তবু ওই নামই রয়েছে।"

মানিক অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল। বলল, "আপনি সিনেমা হাউসে বসে যে ভেলকি দেখালেন, আপনাদের কেষ্টপদ য়ে কাণ্ডটা দেখাল—এ সবই কি ওই পি পি?" বলে মজা করার মুখে হাসল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "খানিকটা তাই।...এসব আপনাদের বিশ্বাস করার কথা নয়। একসময়ে আমিও করতে পারতাম না। আজকাল পারি। আমরা সকলেই যে যার মতন একটা ছোটখাট জগৎ নিয়ে বাস করি। বড় জগৎ অন্য রকম। সেখানে কত কী আশ্চর্য-আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে যায় আমরা জানি না। বুঝি না। অবিশ্বাস করি। অবিশ্বাস করতে পারলে কথা থাকে না, কিন্তু কেউ যদি অবিশ্বাস না করে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে তবে কী হয়।"

বরদা মাথা নাড়ল। ঠিক কথা। বলল, "সেদিন একটা বিদেশী কাগজে একজনের কথা পড়ছিলাম; ছবিও দেখছিলাম। লোকটার নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা; কাঁটা, চামচ, ছুরি বেঁকিয়ে দিতে পারে শুধু চোখের দৃষ্টিতে।"

মানিকেরও যেন মনে পড়ল, এ-রকম একটা খবর সে কাগজে পড়েছে। বলল, "আমিও পড়েছি কোথাও। কাগজের খবর বলে বিশ্বাস করিনি।"

"কেন?" বরদা বলল।

"কাগজে কত গালগল্প বেরোয়; কে আর বিশ্বাস করে।" সিদ্ধেশ্বর কিছু বললেন না। হাঁটতে-হাঁটতে রাস্তার শেষে এসে পড়েছিল বরদারা।

বরদা হঠাৎ বলল, "আচ্ছা, আমরা যদি আপনাদের ওখানে যাই—আমাদের নিয়ে যাবেন? দেখতে দেবেন?"

কথার জবাব না দিয়ে সিদ্ধেশ্বর চৌরঙ্গি রোডের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কিছু ভাবছিলেন। তারপর খুবই আচমকা মানিককে জিজ্ঞেস করলেন, "ক'টা বাজল?"

মানিক ঘড়ি দেখল হাতের; সময় বলল।

সিদ্ধেশ্বর বরদার দিকে তাকালেন। "আপনাদের দেরি হয়ে গেল। আমারও কাজ রয়েছে। আচ্ছা, আসুন তা হলে," বলে সিদ্ধেশ্বর হাত তুললেন, বিদায় জানাবার ভঙ্গি করে।

বরদা বলল, "আপনি আমাদের নিয়ে যেতে চান না?"

"কোথায়?"

"আপনাদের ওখানে?"

"চই বই কী! যেতে চাইলেই যেতে পারবেন।" সিদ্ধেশ্বর আবার হাত তুলে হাসলেন। "আমি আর দাঁড়াব না, যাই।"

চলে গেলেন সিদ্ধেশ্বর।

বরদা আর মানিক সামান্য দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটতে লাগল।

মানিক বলল, "তুই চট্ করে যাবার কথা বলতে গেলি কেন?

বরদা বলল, "বললাম।"

"বললাম! মুখে এল আর বলে ফেললি?"

"কেন, বললে ক্ষতি কিসের?"

"যাবি তুই?"

"যেতে ইচ্ছে করছে। মানে, একবার গিয়ে দেখে এলে হয়।"

"এমন করে বলছিস যেন জায়গাটা বালিগঞ্জ কি বেহালা; ঝট করে গিয়ে দেখে আসা যায়।"

বরদা হাঁটতে হাঁটতে বলল, "তুই যাই বল, ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং।"

"গাঁজাখুরিও হতে পারে।"

"মানে?"

"যদি গিয়ে দেখিস সব বাজে, ধোঁকা..."

"কাল আমি সিনেমা হাউসে যা দেখেছিলাম সেটা ধোঁকা হতে পারে—আমার চোখের ভুলও হতে পারে। কিন্তু আজ কেষ্টপদ যা দেখাল, তুই নিজের চোখে দেখলি। অত বড় একটা পাখির খাঁচা কেউ ফুঁ দিয়ে কিংবা জোরে জোরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে দোলাতে পারে?"

মানিক মাথা নাড়ল। বলল, "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কোনো কায়দা আছে—আমরা যা ধরতে পারিনি।"

বরদা বলল, "কোনো কায়দা ছিল না।"

"তুই কেমন করে জানলি?"

কথার জবাব দিল না বরদা।

আরও একটু এগিয়ে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল বরদা। হাত বাড়িয়ে দাঁড় করাল। বলল, "চল, একটু ট্যাক্সি চড়া যাক।"

মানিকের ইচ্ছে ছিল না ট্যাক্সি চড়ার, অকারণ পয়সা খরচ। বরদা বরাবরই বেহিসেবী। বাড়ির অবস্থা ভাল। অভাব-টভাব তো বুঝল না কোনোদিন। মানিক এভাবে পয়সা ওড়াতে পারে না। ক্ষমতাও নেই তার।

ট্যাক্সিতে উঠে বরদা ড্রাইভারকে শ্যামবাজারের দিকে যেতে বলল। বলে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। "নে।"

সিগারেট ধরাল দুজনে। মানিক হাই তুলল বড় করে।

"সিদ্ধেশ্বরকে তোর ভাল লাগেনি?" বরদা জিজ্ঞেস করল বন্ধুকে।

মানিক চট করে জবাব দিল না। ভাবছিল। বলল, "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"সিদ্ধেশ্বরকে? কেন?"

"কেন তা বলতে পারব না। মনে হচ্ছে, ভদ্রলোকের কোনো মতলব রয়েছে।"

"মতলব?"

"অভিসন্ধি।"

"কিসের অভিসন্ধি?"

"সেটাই বুঝতে পারছি না। এত লোক থাকতে তোকে ওই ভেলকি দেখাবার কী ছিল কাল? আজকেই বা কেন—"

মানিককে কথা শেষ করতে না দিয়ে বরদা বলল, "তুই এখনও চটে রয়েছিস সিদ্ধেশ্বরবাবুর ওপর।"

"চটে নেই। আমার ভাল লাগছে না।...সিদ্ধেশ্বরের মোটিভ কী?"

"আমার কিন্তু ভালই লেগেছে ভদ্রলোককে।"

"বুঝতে পারছি। তোকে এরই মধ্যে বশ করে ফেলেছেন সিদ্ধেশ্বর।" বলে মানিক সামান্য ঠাট্টা করে হাসল। আবার হাই তুলল। বলল, "বড় ঘুম-ঘুম পাচ্ছে রে!"

দেখতে দেখতে ট্যাক্সিটা মেট্রো সিনেমার কাছাকাছি এসে গেল। সামান্য ভিড় এখানটায়। ট্রাফিক লাইটের জন্যে কিছু বাস-টাস, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ট্যাক্সি থামল।

গাড়িটা আবার চলতে শুরু করলে বরদা বলল, "আমার এখন ঢালা ছুটি। চল না, দিন কতক বেড়িয়ে আসি।"

"কোথায়? সিদ্ধেশ্বরদের রিসার্চ সেন্টার থেকে?"

"দুমকা-টুমকা ভাল জায়গা শুনেছি।"

"তুই যা। আমার উপায় নেই। আমি পরের গোলামি করি।"

"ছুটি নে।"

"ছুটি?"

সেন্ট্রাল অ্যাভিনু দিয়ে যেতে যেতে আচমকা বাঁ দিক করে ট্যাক্সি থেমে গেল। নেমে পড়ল ড্রাইভার। বনেট খুলল। খুটখাট করল একটু। ফিরে এসে আবার গাড়ি স্টার্ট দিল।

মানিক জিজ্ঞেস করল, "ঠিক আছে?"

মাথা হেলিয়ে ড্রাইভার বলল, ঠিক আছে।

বরদা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল। কলকাতা বড় অদ্ভুত শহর। এত বড় রাস্তার এই দিকটা এখন কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঝাপসা দেখাচ্ছে। সারাদিন পরে যেন রাস্তাটাও ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।

মানিক নামবে বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে; বরদা যাবে গ্রে স্ট্রীট। ট্যাক্সিটাকে ডান দিকে বাঁক নিতে বলল বরদা। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ধরে যাবে, পথে মানিককে নামিয়ে দেবে।

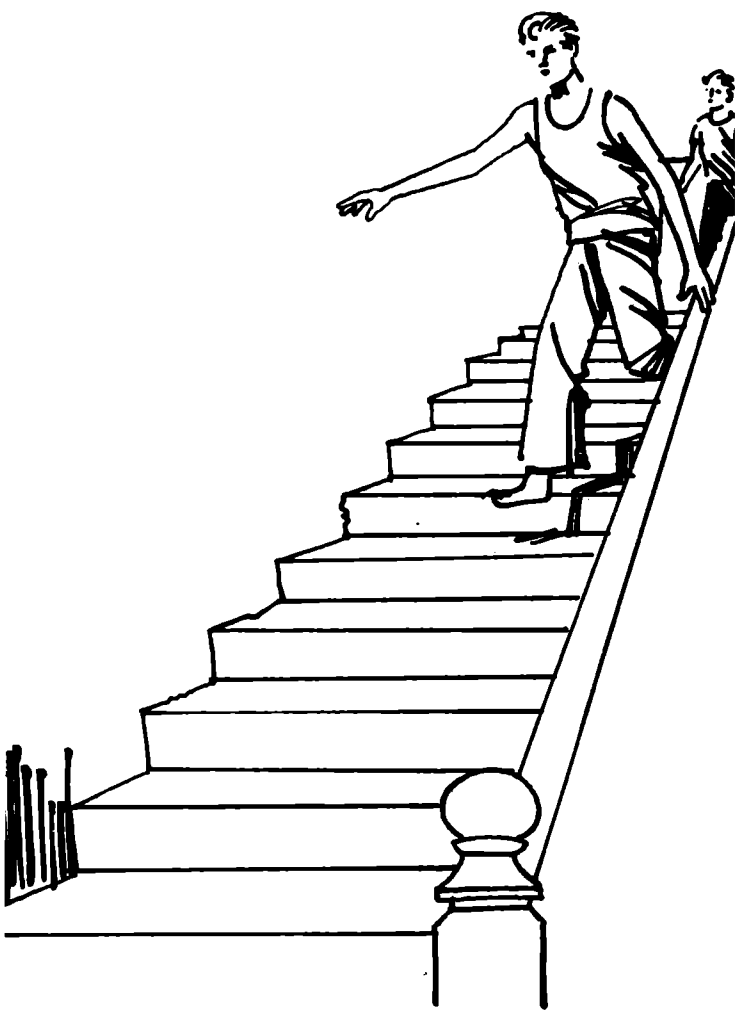

বাড়ি ফিরে বরদা নিজের ঘরে চলে গেল। তার ঘর তেতলায়। পুরনো আমলের বাড়ি, দেখতে অনেকটা মেসবাড়ির মতন মনে হয় ভেতরটা। লোকজনও কম নয় বাড়িতে। বরদা অনেক দিন আগেই তেতলায় উঠে গেছে। ছাদটাদ রয়েছে তেতলায়। অনেক ফাঁকা। আলো বাতাস পাওয়া যায়।

ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালল বরদা। জামা-প্যান্ট বদলাবে। পকেট থেকে পয়সা-কড়ি, সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই রুমাল বার করার সময় তার হাতে ভাঁজ করা কাগজ উঠে এল।

কী ব্যাপার?

কাগজটা খুলল বরদা। খুলে অবাক হয়ে গেল। তার বিশ্বাস হল না। ভাল করে দেখল।

সিদ্ধেশ্বর এই কাগজের টুকরোটা কখন যেন পকেটের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন, কিংবা গুঁজে দিয়েছেন বরদা বুঝতেই পারেনি।

আলোয় মেলে ধরে লেখাটা পড়ল বরদা।

"আমি পরশু দিন—বুধবার ফিরে যাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আপনার বন্ধু মানিকবাবু নিজেকে যতটা চালাক মনে করেন ততটা চালাক তিনি নন। তিনি ইচ্ছে করলে আপনার সঙ্গে আসতে পারেন। না এলেও কোনো ক্ষতি নেই। আপনার সব দায়িত্ব আমার। কোনো ভয় নেই। আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। আমি জানি, আপনি যাবেন। আগামী কাল বিকেলে আপনি একবার নিউ মার্কেটের সামনে আসবেন। পাঁচটা নাগাদ। কথা হবে। যদি না আসেন, বুঝব আপনি যেতে অনিচ্ছুক।"

বরদা বার কয়েক চিঠিটা পড়ল।

কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রেখে দেবার সময় হঠাৎ তার মনে হল, সিদ্ধেশ্বর যেন পেছনে কাঁধের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। শিউরে উঠে ঘাড় ঘোরাল বরদা—কেউ নেই।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছিল। কে যেন আসছে।

ছোট ভাই সারদা এল ছুটতে ছুটতে। "দাদা, শিগগির এসো। মানিকদা তোমায় ফোন করছে। মানিকদার কী যেন হয়েছে।"

বরদা আঁতকে উঠল। ফোন ধরতে ছুটল নীচে।

ফোন ধরে বরদা বলল, "হ্যালো—মানিক—মানিক?"

ও পাশ থেকে কার যেন গলা পাওয়া গেল, ভাঙা গলা, সামান্য জড়ানো। মানিকের গলা বলে মনে হয় না।

জড়ানো, ভাঙা-ভাঙা গলায় মানিক বলল, "বরদা, বাড়ি ফিরে আসার পর আমার চোখে কী যেন হয়ে গেছে। ভাল করে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সব ঝাপসা দেখাচ্ছে। সিদ্ধেশ্বর আমাদের কিছু খাইয়ে দিয়েছে চায়ের সঙ্গে। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে চোখে। ঘুম পাচ্ছে।"

বরদার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। বলল, "কী বলছিস তুই! আমি তো চোখে দেখতে পাচ্ছি।"

"আমি ঝাপসা দেখছি।"

"ডাক্তারের কাছে যা।"

"ডাক্তারখানা থেকেই ফোন করছি।"

বরদা কোনো কথা খুঁজে পেল না। মানিক, বরদা, সিদ্ধেশ্বর—একই সঙ্গে চা খেয়েছে। মানিককে কিছু খাইয়ে দেবার সুযোগ তো সিদ্ধেশ্বরের ছিল না। তবে?

"আমি কি তোর বাড়িতে আসব?"

"কাল সকালে আসিস। আজ এসে কী করবি।"

"তোকে কিছু খাওয়াবে কী করে? আমরা একই সঙ্গে চা খেয়েছি।"

"জানি না। সিদ্ধেশ্বর সবই পারে। আমার চোখ যদি কাল সকালে ঠিক না হয়ে যায়, আমি ওকে দেখে নেব।"

বরদা ফোন হাতে দাঁড়িয়ে থাকল। কথা বলতে পারল না।

(ক্রমশ)

ছবি মদন সরকার

ডোডো তাতাই

লেখা। তারাপদ রায়
রেখা। কৃত্তিবাস রায়

তাতাইবাবুদের বাড়ির রাস্তায় যে কুকুরগুলো থাকে তাদের মতো শান্তশিষ্ট জানোয়ার ভূ-ভারতে নেই। রাস্তার লোকেরা তাদের লেজ মাড়িয়ে দেয়, ছোট ছেলেরা তাদের পিঠে চড়ে ঘোড়ার মতো চাবুক মেরে চালায়, কোনো কিছুতে ঐ কুকুরগুলো বিন্দুমাত্র আপত্তি করে না। কিন্তু, গোলমাল হয়েছে মোটর সাইকেল নিয়ে, দূরে কোথাও মোটর সাইকেল বা স্কুটারের ক্ষীণতম শব্দ শোনা যাওয়ামাত্র সবগুলো কুকুর একসঙ্গে উত্তেজিত হয়ে পড়ে পাগলের মতো অস্থির হয়ে ছুটে যায় দ্রুত ধাবমান মোটর সাইকেলের দিকে। মোটর সাইকেল আরোহীরা এই হঠাৎ আক্রমণে দিশেহারা হয়ে যান, দু-একবার কেউ-কেউ রাস্তায় উল্টে পড়েও গেছেন কুকুরের আক্রমণ পাশ কাটাতে গিয়ে এবং আশ্চর্যের কথা, যে মুহূর্তে তাঁরা পড়ে গেছেন কুকুররা আর কিছু বলেনি, যেন কিছুই ঘটেনি এই ভাবে নিঃশব্দে ফিরে গেছে।

তাতাইবাবু নিজে মোটর সাইকেলের খুব ভক্ত। রাস্তায় কোথাও মোটর সাইকেল দাঁড় করানো দেখলেই তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। জীবনে মোটর সাইকেল চড়ার খুব একটা সুযোগ পাননি। একবার কলকাতার বাইরে আধ মাইল, আরেকবার কালীঘাট থেকে গোল-পার্ক, এইটুকু। তাতাইবাবু চান পাড়ার মধ্যে একদিন মোটর সাইকেল চড়েন, বিশেষ করে কুকুরেরা তাঁকেও তাড়া করে কিনা এটা তাঁর জানার খুব ইচ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যায় ডোডোবাবুও এসেছেন, এমন সময় তাতাইবাবুর কাকা এলেন মোটর সাইকেলে। ডোডোবাবু-তাতাইবাবু জোর করে তাঁর সাইকেলে চেপে বসলেন, তাঁরা দুজনেই অবাক, কাকা এটা পেলেন কী করে? আসলে ওটা কাকার বন্ধুর সাইকেল, সে সিনেমায় গেছে, তাই কাকা ওটা চড়ে এসেছেন। ডোডোবাবু-তাতাইবাবুকে নিয়ে কাকা যেই মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়েছেন অমনি রাস্তার কুকুরেরা ক্ষেপে উঠল। গাড়ি থামাতেই তারা শান্ত হয়ে চেনা লোক দেখে লেজ নাড়ে, আর দুলে উঠতেই খেঁকিয়ে ওঠে। কয়েক মিনিট এই মজা চলবার পর কাকা হঠাৎ দুজনকে নিয়ে হুস করে পাড়া পার হয়ে সোজা লেকে। একঘণ্টা পর যখন সবাই অনেক বেড়িয়ে ফিরে এল তখন কুকুরগুলো কী বুঝে আর কিছুই বলল না, পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

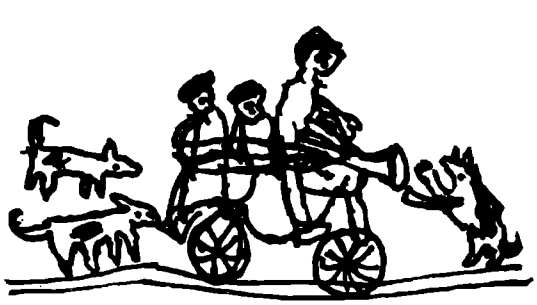

তুতুনের ঘুমের ওষুধ

শেখর বসু

তুতুনের সব ভাল। তুতুন পড়তে পারে, লিখতে পারে, ছড়া মুখস্থ বলতে পারে, ওর দোষ শুধু একটাই। তুতুন না...

তুতুনের মা এইভাবে কারও সঙ্গে কথা শুরু করলে তুতুন বুঝতে পারে, মা কী বলতে চাইছে। ও তখন ছুটে গিয়ে মায়ের মুখের ওপর ছোট-ছোট হাতদুটো চেপে ধরে বলে, "মা, বোলো না, বোলো না।"

তাই না শুনে মা মুখ টিপে হেসে বলে, "ঠিক আছে, বলব না, কিন্তু তুমি আর কক্ষনো খাবে না তো?"

তুতুন দুপাশে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, "না।"

তুতুন কী খাবে না বলছে? বাইরের লোক তখন আর জানতে পারে না। কেউ জিজ্ঞেস করলেও মা বলে না, আর তুতুন তো বলবেই না। ও জেনে গেছে, ওটা খুব লজ্জার ব্যাপার। ও কদ্দিন চেষ্টা করেছে না-খাওয়ার জন্যে, এমন অনেকদিন গেছে যে, সারাদিন ও একবারও খায়নি। কিন্তু, ঘুমের সময় একটু না খেলে যে কিছুতেই ঘুম আসে না!

ও যখন ঘুমোয়, তখন মা ওর পাশে বসে সেলাই করে, উল বোনে, না হলে শুয়ে-শুয়ে গল্পের বই পড়ে। একদিন তুতুনের দুচোখে যখন খুব ঘুম এসে গেল ও তখন মাকে বলল, "মা যাও না তুমি আর একটু রান্না করে এসো।"

মা বলল, "আর কত রান্না করব? আমার রান্নাবান্না সব শেষ।"

"তাহলে তুমি ছবি কাকীমার সঙ্গে গল্প করতে যাও।"

"এত রাত্তিরে কেউ গল্প করতে যায় বুঝি?"

"তাহলে তুমি ও ঘরে গিয়ে গান শোনো।"

"বকবক কোরো না তো, ঘুমোও এবার।"

কী আর করবে তুতুন। ও গড়াতে গড়াতে খাটের এক ধারে গিয়ে মায়ের দিকে পেছন ফিরে শুয়ে পড়ল। তারপর খেতে লাগল।

একটু পরেই শব্দ উঠতে লাগল—চুক-চুক-চুক। শব্দ শুনে মা বলল, "ও মা! এইজন্যেই তুমি আমাকে এ-ঘর থেকে তাড়াতে চাইছিলে! বার করো, বার করো আঙুল মুখ থেকে। বলেছি না, কক্ষনো আঙুল খাবে না।"

ঘুম-জড়ানো গলায় তুতুন বলল, "মা, একটু খাই।"

মা বলল, "আঙুল খেলে অসুখ করে।"

"আঙুল তো ধুয়ে নিয়েছি মা।"

"ধুলেও করে। আর আঙুল খেলে তুমি স্কুলে ভর্তি হবে কী করে?"

আঙুল খাওয়া না-খাওয়ার সঙ্গে স্কুলে ভর্তি হওয়ার কী সম্পর্ক, তুতুন বুঝতে পারল না। ও অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাতেই মা বলল, "আঙুল খেলে আঙুল ছোট হয়ে যাবে। আর, আঙুল ছোট হয়ে গেলে তুমি পেনসিল ধরতে পারবে না, কলম ধরতে পারবে না। পেনসিল-কলম ধরতে না পারলে তুমি লিখতে পারবে না। লিখতে না পারলে তোমাকে স্কুলে ভর্তিই করবে না।"

তুতুনের ভীষণ স্কুলে যাবার শখ। ওর বন্ধুদের অনেকেই স্কুলে যায়। সবার হাতেই থাকে বইয়ের বাক্স, টিফিন কৌটো, আর কাঁধে লাল-নীল জলের বোতল। এইসব দেখে ওর মনে হয়, বাড়ির পড়াশোনার চাইতে স্কুলের পড়াশোনা অনেক ভাল। সেই স্কুলে আঙুল খাওয়ার দোষে যেতে পারবে না শুনে ওর মন খারাপ হয়ে গেল।

ওকে মন খারাপ করতে দেখে মা বলল, "তুমি যদি আঙুল না খাও, তাহলে তোমার আঙুল ছোট হবে না। আর আঙুল ছোট না হলে তুমি স্কুলে গিয়ে আর-সকলের মতো লেখাপড়া করতে পারবে।"

তুতুন একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিল, "মা, আমি তো আঙুল খেতে চাই না। কিন্তু, যেই না ঘুম পায়, অমনি আঙুলটা আমার মুখে ঢুকে যায়। আঙুলটা খুব দুষ্টু।"

মা হেসে বলল, "হ্যাঁ, তুমি তো আমার সোনামণি, আঙুলটাই দুষ্টু। এক কাজ করো, তুমি এইভাবে ঘুমোও, তাহলে আঙুলটা আর তোমার মুখে যেতে পারবে না।" এই না বলে মা পাশবালিশটা তুতুনের দু'হাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি এই হাত দিয়ে ওই হাতটা ধরো, মধ্যিখানে থাকল পাশবালিশ। ব্যাস, দুষ্টু আঙুলটা আর তোমার মুখে ঢুকতে পারবে না।"

আঙুলকে জব্দ করার কায়দাটা তুতুনের খুব ভাল লেগে গেল। ও এক হাত দিয়ে আর-এক হাত ধরে রাখল শক্ত করে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল একসময়। ঘুমিয়ে পড়েছে তো, সেই জন্যে টের পেল না দুষ্টু আঙুলটা কখন আবার ওর মুখের মধ্যে ঢুকে গেছে। জানতে পারল শুধু মা। মা তো আর ঘুমোয়নি, তাই একটু পরেই মা দেখল, তুতুন আঙুল চুষছে। শব্দ উঠছে—চুক-চুক-চুক।

পরদিন বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসে বলল, "তুতুন, এই দেখো তোমার জন্যে একটা ওষুধ নিয়ে এসেছি।" ওষুধ দেখে তুতুন অবাক। বাবা রোজ ওর জন্যে হয় ক্যাডবেরি,

বিস্কুট নিয়ে আসে। আজ ওষুধ কেন?

ওষুধের শিশিটা ও হাতে নিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "ওষুধ এনেছ কেন, আমার কি অসুখ করেছে?"

বাবা বলল, "না-না, তোমার অসুখ হবে কেন? শুনলাম তোমার আঙুলটা দুষ্টুমি করে মুখে ঢুকে যাচ্ছে। এই ওষুধটা এবার থেকে ঘুমোবার সময় আঙুলে লাগিয়ে দেবে, ব্যাস, আঙুল আর একটুও দুষ্টুমি করতে পারবে না।"

তুতুন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। বাবা ওর হাত থেকে ওষুধের শিশিটা নিয়ে আলমারির মাথায় রেখে দিল।

রাত্তিরবেলা তুতুন খাওয়া-দাওয়া সেরে শোবার পরে মা শিশিটা খুলে একটু ওষুধ লাগিয়ে দিল ওর আঙুলে। তুতুন একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল আঙুলটার দিকে। কিন্তু কই, ওষুধ লাগাবার পরেও আঙুলটা জব্দ হল না তো! একটু পরেই ওর ঘুম পেয়ে গেল ভীষণ, আর অভ্যেসমতো আঙুলটা মুখে ঢোকাতেই—অ্যা! কী তেতো! কী তেতো!

ওকে ওইরকম করতে দেখে মা হেসে ফেলল। মা হাসতেই তুতুন রেগে গিয়ে বলল, "তুমি বলেছিলে আঙুলটা জব্দ হবে। আঙুলের কিছু হল না। আমার মুখটাই তেতো হয়ে গেল।"

মা আঁচল দিয়ে হাসি চেপে বলল, "দুষ্টু আঙুলটা তেতো হয়ে গেছে, তুমি আর কক্ষনো ওকে মুখে ঢুকতে দেবে না।"

তুতুন আঙুলটা দূরে সরিয়ে রাখল। কিন্তু, আঙুল মুখে না দিলে যে ওর কিছুতেই ঘুম আসে না!

মা পাশ ফিরে শুয়ে গল্পের বই পড়ছে। তুতুন হঠাৎ খাট থেকে নেমে চুপি-চুপি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তারপর বাথরুমে গিয়ে আঙুলটা ভাল করে ধুয়ে ফিরে এল। একটু পরেই শব্দ উঠতে লাগল—চুক-চুক-চুক। মা অবাক হয়ে দেখে, তুতুন অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আর ওর আঙুল মুখের মধ্যে।

তেতো ওষুধ আঙুলে লাগিয়েও তুতুনের আঙুল খাওয়া বন্ধ করা গেল না। ও ঠিক এক ফাঁকে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে আঙুল ধুয়ে আসবে, না হলে ভেজা তোয়ালেতে আঙুল মুছে নেবে ভাল করে। বোঝানো, বকুনিতেও কোনো কাজ হয় না। আঙুল খাওয়া খারাপ, লজ্জার—এটা তুতুন বোঝে, কিন্তু বুঝেও ও ছাড়তে পারে না, আঙুল না খেলে যে ওর ঘুমই আসে না।

একদিন সন্ধে হতে না হতেই ঝুপ করে বাড়ির সব আলো নিবে গেল। শুধু ওদের বাড়ির নয়, সারা পাড়ার। এক নিমেষে অন্ধকার হয়ে গেল এ-বাড়ি সে-বাড়ি। আলো নিবে গেলে বড়রা সব হায়-হায় করে, কিন্তু তুতুনের বেশ মজা লাগে। ঘরে-ঘরে মোমবাতি জ্বলে। মোমবাতির আলো কী ভাল! আজও মোমবাতি জ্বলল। অন্যান্য দিন একটা মোমবাতি শেষ হতে না হতেই দেয়ালের আলোগুলো জ্বলে ওঠে দপ করে। আজ কিন্তু আর জ্বলল না। একটা মোমবাতি শেষ হল, দুটো শেষ হল, তিনটে শেষ হল—তাও দেয়ালের আলো জ্বলল না। মা রাগ-রাগ মুখ করে বলল, "যা গরম! পাখা না চললে তো দেখছি রাতে ঘুমোতেই পারব না।"

মোমবাতির আলোতেই তুতুন খেল, তারপরে মোমবাতির আলোতেই ঘরে এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

সকালবেলায় তুতুন ঘুম থেকে উঠে দেখে মায়ের মুখটা আরও রাগ-রাগ হয়ে গেছে। মা সকালে কত আদর করে তুতুনকে, আজ আদর তো করলই না, উলটে শুধু-শুধু ধমক লাগিয়ে দিল ওকে।

ধমক খেলে তুতুনের গলার ভেতরটা ভার-ভার হয়ে যায়, চোখে জল আসে। ও রাগ করে মায়ের সঙ্গে কথাই বলল না অনেকক্ষণ। রাগ কমল দুপুরে চান করে ভাত খাওয়ার পরে।

খাওয়ার পরে ও মায়ের সঙ্গে শোবার ঘরে আসে। এখন গরমকাল, মা তাই ঘরের সব জানলা-দরজা বন্ধ করে পাখা চালিয়ে ঘুমোয়। দুপুরে তুতুনের একটুও ঘুমোতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু মা শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ে।

আজকেও মা ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে সুইচ টিপল, অথচ পাখা ঘুরল না। পাখা চলল না দেখে মা রেগে গেল ভীষণ। তারপর নিজের মনেই বলতে লাগল, "এখনও আলো-পাখা এল না! এইভাবে কি মানুষ বাঁচতে পারে? না ঘুমিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কি নেমন্তন্ন খেতে যাওয়া যায়! আজ সন্ধে-বেলায় আমি আর অনুদের বাড়িতে যাচ্ছি না।"

নেমন্তন্ন আর অনুদের বাড়ি—এই দুটো কথা কানে যেতেই তুতুন বলল, "মা, আজ কি আমাদের অনুদের বাড়িতে নেমন্তন্ন?"

মা খবরের কাগজ দিয়ে হাওয়া খেতে-খেতে বলল, "হ্যাঁ, তবে আমি যেতে পারব না। তুমি তোমার বাবার সঙ্গে যেও।" অনুদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার কথায় তুতুনের খুব আনন্দ হল, কিন্তু মা যেতে পারবে না শুনে মন খারাপও হয়ে গেল সেই সঙ্গে। মা সঙ্গে না থাকলে তুতুনের কোথাও যেতে ভাল লাগে না।

"মা, তুমি কেন যাবে না?"

মায়ের মুখটা এখনও রাগ-রাগ। বলল, "কী করে যাব? কাল রাত্তিরে ঘুমোতে পারিনি, এখনও পারব না। যা গরম! পাখা ছাড়া এই গরমে কেউ ঘুমোতে পারে? জানলাও খোলা যাবে না, বাইরে লু বইছে।"

মা শুয়ে-শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে তখন থেকে। আঁচল দিয়ে গলার ঘাম মুছছে বারবার। মাঝেমধ্যে খবরের কাগজ দিয়ে হাওয়া খাচ্ছে। মায়ের কষ্ট দেখে তুতুনেরও কষ্ট হচ্ছে খুব,

শুধুমাত্র পাশ করতে নয়,
মাধ্যমিক পরীক্ষায় বেশী নম্বর তুলতে
অদ্বিতীয় অভিনব এক বই!
AN ANALYTICAL APPROACH TO
EXHAUSTIVE
QUESTIONS
FOR
NINETEEN SEVENTYEIGHT & NINETEEN SEVENTYNINE
Price : Rs. 15/- only
এ বই কিনলে TEST PAPER
কেনার আর দরকার হয় না
B. B. KUNDU & SONS
18L, TAMER LANE, CALCUTTA-9
Phone : 34-7328

কিন্তু ওর তো কিছু করার নেই। অনেক দূরে বসে-বসে সবার বাড়িতে হর আলো জ্বালায়, পাখা ঘোরায়, তাদের ওপর ওর খুব রাগ হয়ে গেল।

আর, রাগ হতেই তুতুনের মাথায় বুদ্ধি এসে গেল একটা। ও আস্তে আস্তে বলল, "মা একটা কাজ করবে, তাহলে ঠিক তোমার ঘুম এসে যাবে।"

মা ওর দিকে তাকাতেই তুতুন বলল, "তুমি তোমার আঙুলটা খাও, খেলেই ঘুমিয়ে পড়বে।"

মা হেসে ফেলে বলল, "যাঃ।"

তুতুন কিন্তু নাছোড়। ও বারবার একই কথা বলতে লাগল মাকে। অনেকক্ষণ পরে, কিছুতেই ঘুম আসছে না দেখে মা তুতুনের মতো বুড়ো আঙুলটা ঢুকিয়ে দিল নিজের মুখের মধ্যে। মায়ের মুখে আঙুল। শব্দ উঠছে—চুক-চুক-চুক। একটু পরে তুতুন অবাক হয়ে দেখল, মা ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুম থেকে ওঠার পরে মা আবার আগের মতো হাসিখুশি। মুখে একটুও আর রাগ-রাগ ভাব নেই।

সন্ধেবেলায় অনুদের বাড়িতে গিয়ে খুব মজা করল তুতুনরা। খাওয়াদাওয়াও হল অনেক। তুতুন একাই তিনটে আইসক্রিম খেল। তারপর ওরা বাড়ি ফিরে এল। বাড়িতে আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে। আলো, পাখা দেখে তুতুনের মা খুব খুশি।

তুতুনের বাবা রোজ রাত্তিরে খাওয়ার পরে অঙ্ক কষতে বসে। বাবাদের অফিসে শুধু অঙ্ক কষার কাজ। বাবা অফিসের কাজ বাড়িতেও নিয়ে আসে। আজ তো অনুদের বাড়িতেই নেমন্তন্ন খাওয়া হয়ে গেছে, বাবা তাই বাড়িতে এসেই কাগজ-পত্তর টেনে নিয়ে অঙ্ক কষতে বসে গেল।

তুতুনের ভীষণ ঘুম পেয়ে গিয়েছিল, ও বিছানায় শোওয়া মাত্তরই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল তিন-চারটে। তারপর মাঝরাত্তিরে চেঁচামেচি শুনে ওর ঘুম ভেঙে গেল।

মা ওর পাশে শুয়ে, আর বাবা দাঁড়িয়ে আছে মেঝেয়। বাবার মুখটা রাগ-রাগ। বাবা মাকে বলল, "বাড়িতে ঘুমের ওষুধ নেই, তুমি আমাকে আগে বললে না কেন? কাল অফিসে জরুরি মিটিং আছে, রাত্তিরে ঘুমোতে না-পারলে খুব মুশকিলে পড়ে যাব।"

মা একটু মুচকি হেসে বলল, "তোমাকে আমি যা করতে বললাম, তাই করো না, দেখবে ঠিক ঘুম এসে যাবে।"

বাবা আরও রেগে গিয়ে বলল, "তোমার মাথা।" তারপর আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

মা আস্তে আস্তে বলল, "তখন থেকে তুমি ছটফট করছ, যা বললাম তাই করে দেখো না একবার, দেখবে ঠিক ঘুম আসবে।"

বাবা এবার আর কোনো উত্তর দিল না। একটু পর তুতুন হঠাৎ শুনতে পেল, কোত্থেকে যেন শব্দ উঠছে—চুক-চুক-চুক। বাবা শুয়ে আছে বিছানার এক ধারে। মনে হচ্ছে, শব্দটা ওই দিক থেকেই আসছে। তুতুন গড়িয়ে গড়িয়ে বাবার কাছে চলে গেল, তারপর একটু উঁচু হয়ে দেখল, বাবার মুখে বুড়ো আঙুল, বাবা আঙুল চুষছে চোখ বন্ধ করে।

কিছুক্ষণ পরেই ঘর্ঘর ঘর্ঘর করে বাবার নাক ডাকতে লাগল। তুতুন জানে, বড়রা ঘুমিয়ে পড়লে ওদের নাক ডাকে। নাক যখন ডাকছে, বাবা তখন নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশ্চিন্ত হয়ে তুতুন নিজের বুড়ো আঙুলটা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। সবে চুষতে যাবে এমনসময় মায়ের দিক থেকেও একটা শব্দ ভেসে এল—চুক-চুক-চুক।

ছবি সমীর সরকার

বিশ্ব-বিচিত্রা

দিদিমণি

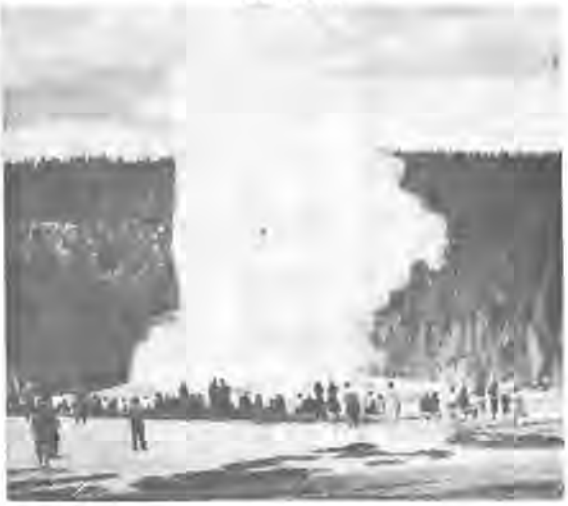

উষ্ণ প্রস্রবণ ও গীজার

যে-সব জায়গায় অগ্ন্যুৎপাত হয়, সাধারণত সেই সব জায়গাতেই উষ্ণ প্রস্রবণ দেখা যায়। মাটির ভিতরের জল অনেক নীচে নেমে গিয়ে যদি গরম অবস্থার চাপের ফলে তাড়াতাড়ি মাটির ওপরে উঠে আসে তা হলেই উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে অনেক জায়গায় উষ্ণ প্রস্রবণ দেখতে পাওয়া যায়। এই সব উষ্ণ প্রস্রবণে এমন অনেক খনিজ পদার্থ মেশানো থাকে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। ভারতে অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। যেমন, বীরভূমের বক্রেশ্বরে, বিহারের রাজগীরে এবং মুঙ্গের জেলার সীতাকুণ্ডে। এ-ছাড়াও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলেও অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বদ্রীনাথের মন্দিরের কাছে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, মানালির বশিষ্ঠ প্রস্রবণও বিখ্যাত। এই সব উষ্ণ প্রস্রবণে মাটির তলা থেকে গরম জলের ধারা নিজে থেকেই অনবরত বেরিয়ে আসছে—বুদ-বুদ করে বুড়বুড়ি কেটে—জল নীচে থেকে ওপরে সজোরে উৎক্ষিপ্ত হয় না।

আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েলোস্টোন পার্কে অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। আলাস্কা, তিব্বত, জাপান, মালয় উপদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকাতেও গীজার আছে। ভূত্বকের অনেক অংশ পাহাড় তৈরি বা অন্যান্য অনেক কারণে নীচে বহু দূর পর্যন্ত ফেটে যায়—সেই ফাটলের নীচে মাটির তলার জল এসে পৌঁছলে ভীষণ গরম হয়ে বাষ্পে পরিণত হয়ে মাটির স্তরের ওপর প্রবল চাপের সৃষ্টি করে এবং গরম জল এক স্তম্ভের আকারে উৎক্ষিপ্ত করে বাইরে বেরিয়ে আসে। কতক্ষণ পরে পরে জল বাইরে বেরিয়ে আসবে তার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে—সেই সময়ের ব্যবধানে জল বাইরে আসে। এই জলস্তম্ভ কয়েক ইঞ্চি থেকে আরম্ভ করে কয়েক শো ফুট উঁচু হতে পারে। আইসল্যান্ডের হেকলা আগ্নেয়গিরির গ্রেট গীজারের নাম অনুসারে এই ধরনের ফোয়ারার মতো উষ্ণ প্রস্রবণগুলির নাম রাখা হয়েছে গীজার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রকি পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে ওয়াওমিং, মন্টানা এবং ইডাহো রাজ্য এসে মিলিত হয়েছে সেখানে রয়েছে বিখ্যাত ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক। এখানে যত গীজার আছে পৃথিবীর আর কোথাও তত গীজার নেই। এখানকার ওল্ড ফেথফুল গীজার খুবই বিখ্যাত। আইসল্যান্ড দ্বীপে তিরিশটি সক্রিয় গীজার আছে, ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে আছে দুশোটি। সাধারণ উষ্ণ প্রস্রবণের জলধারা ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় না, কিন্তু গীজারের জলধারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে জল ও বাষ্প সহকারে প্রবল বেগে বাইরে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই হল উষ্ণ প্রস্রবণ ও গীজারের মধ্যে পার্থক্য। সোডার বোতল খুললে যেমন সবেগে সোডা বেরিয়ে আসে গীজারের জলও অনেকটা সেইরকম-ভাবেই বাইরে বেরিয়ে আসে। সাধারণত যে-সব জায়গায় পাহাড় ও আগ্নেয়গিরি বেশি আছে সেইখানেই এগুলি দেখা যায়।

শিশুদের-কিশোরদের— যত ছোটদের বই

সত্যজিৎ রায় বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের সবচেয়ে নামী ঘরানার এখনকার সবসেরা ধারক-বাহকের নাম। টুনটুনির বই, সন্দেশ, আবোল তাবোল, হ-য-ব-র-ল'র ঐতিহ্যে নতুন অথচ স্থায়ী সংযোজন তাঁর অবিস্মরণীয় ফেলুদা ও প্রোফেসর শঙ্কু। এদের কীর্তিকলাপ-কান্ডকারখানার দারুণ দারুণ কতকগুলি বই।

বাদশাহী আংটি ৫.০০
এক ডজন গপ্পো ১০.০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কান্ডকারখানা ৫.০০
গ্যাংটকে গন্ডগোল ৫.০০
সোনার কেল্লা ৬.০০
বাক্স-রহস্য ৫.০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫.০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬.৫০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫.০০
আরো এক ডজন ১০.০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬.০০
ফটিকচাঁদ ৮.০০
ফেলুদা এন্ড কোং ৮.০০

সুকুমার রায়
সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০.০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫.০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০.০০
জীবজন্তু ৮.০০

শিবরাম চক্রবর্তী
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪.০০
শিব্রামের বারো আড়ি ৫.০০
দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৫.০০
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী ৬.০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী
নিশীথ রাতের আহ্বান ৩.০০

গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩.০০

বিমল কর
ওআন্ডার মামা ৬.০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭.০০

আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫.০০

পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪.০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪.০০
রসায়নের ভেল্কি ৩.০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫.০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২.০০

সরলাবালা সরকার
পিন্কুর ডাইরি ৪.০০

মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬.০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক ৪.০০

মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭.০০

শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩.০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪.০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬.০০
বাজনা ৫.০০
হুশ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫.০০
আমার নাম টায়রা ৫.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫.০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৫.০০

পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫.০০
পাপুর বই ৬.০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫.০০
পাথরের চোখ ৬.০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬.০০
পাঁচমুন্ডীর আসর ৬.০০

বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫.০০
ঝাঁকিদর্শন ৬.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪.০০

ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫.০০
শরৎ কথামালা ১০.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৪.০০
সত্যি রাজপুত্র ৫.০০
তিন নম্বর চোখ ৫.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঘন্টাদার কাবলু কাকা ৫.০০
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬.০০
তপন চরিত ৫.০০

মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪.০০
স্ট্রাইকার ৬.০০
স্টপার ১০.০০
কোনি ৬.০০

সমরজিৎ কর
একটি সংকেতের জন্যে ৬.০০

নারায়ণ চক্রবর্তী
হলদে সবুজ ক্রিস্টাল ১০.০১

পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪.০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪.০০

লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪.০০

অমরনাথ রায়
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ১০.০০

আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪.০০

সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫.০০

অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩.০০

ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ী ৪.০০

গিরিধারী কুন্ডু
টংসা চু ৫.০০

সুবোধ ঘোষ
সেই অদ্ভুত অভ্রর্থান ৫.০০

বিমল মিত্র
রাজা হওয়ার ঝকমারি ৭.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

উপন্যাস

বন্ধ ঘরের আওয়াজ

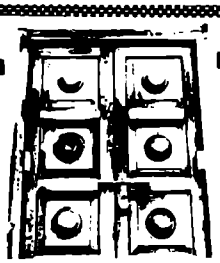

সমরেশ বসু

আগে যা ঘটেছে

গোগোল আজ ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই শুনেছিল, সেভেনথ্ ফ্লোরের ডাবুদা এখনো অবধি বাড়ি ফেরেনি। ওয়্যারলেস ভ্যানে পুলিস অফিসাররা এসে ঘুরে গিয়েছেন। গোগোল ডাবুদাদের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল ঘটনা সব শোনবার জন্য। তখনো অফিসাররা ছিলেন। গোগোল ডাবুদাদের ফ্ল্যাটে ঢোকার সময়েই ড্রাইভারের মত দেখতে একটা অচেনা লোককে লিফ্‌টে করে নীচে নামতে দেখেছিল। ডাবুদাদের ফ্লাটে তার মা-দিদিরা কান্নাকাটি করছিলেন। ডাবুদার বাবা, অফিসাররা ছাড়াও, সেখানে এই ফ্ল্যাটবাড়ির কয়েকজনের সঙ্গে সীতারাম হনুমন্তিয়াজী ছিলেন। তাঁর একটা কথা গোগোলের মাথায় বিঁধে গিয়েছে। তিনি বলেছিলেন, ডাবুদাকে হয়তো কোনো বাজে লোক ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। এখন ডাবুদার বাবা নীহারবাবুর কাছ থেকে মোটা টাকা দাবি করবে। টাকা না পেলে ডাবুদাকে হয়তো মেরেই ফেলবে। গোগোলের বাবাও সেই সময়ে ডাবুদাদের ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। গোগোল নীচে ওর বন্ধুদের হনুমন্তিয়াজীর কথাগুলো বলবার জন্য ছুটে গিয়েছিল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার সময় সিক্সথ্ ফ্লোরে, মহেশানিদের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার ভিতরে যেন কার গলার চাপা স্বর আর শব্দ শুনেছিল। নীচে এসে বন্ধুদের হনুমন্তিয়াজীর কথা বলার পরে, ও শুনল, রাস্তার মোড়ে ব্যান্ড-মাস্টারের ঘরে আড্ডা দেয়, দুটো বাজে ছেলে পিলু আর জ্যাকিকে নাকি পুলিস থানায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। ওর বন্ধুদের মধ্যে ছিল, সুমিত, গোগে, জর্জ, টুকাই আর পারভেজ। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলবার ফাঁকেই গোগোল দেখল, ড্রাইভারের মতো দেখতে সেই লোকটা আবার ফিরে এসে লিফ্‌টে উঠে, একেবারে সেভেন্‌থ ফ্লোরে উঠে গেল। আর তখনই ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মহেশানিরা গত সপ্তাহে সবাই দিল্লি চলে গিয়েছেন। তাঁদের খালি ফ্ল্যাটে তা হলে কার চাপা স্বর আর শব্দ শোনা গেল? ভেবেই গোগোল, লিফ্‌ট্ নেমে আসতেই সিকস্‌থ্ ফ্লোরে উঠে গিয়েছিল। মহেশানিদের দরজায় ইয়েল লকের ছিদ্রে উঁকি দিয়েছিল। কিছুই দেখতে পায়নি, কিন্তু সাপের হিসিয়ে ওঠার মতো একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিছনের সিঁড়িতে যেন কার পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকিয়েছিল। কারোকে দেখতে পায়নি। গোগোল তখন ওপরতলায় উঠে দেখেছিল, লিফ্‌টের সামনে সেই ড্রাইভারের মতো দেখতে অচেনা লোকটাই দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার সঙ্গে গোগোল একলাই আবার নীচে নেমে এসেছিল। লোকটার চোখ দুটো যেন বাঘের মতো। সে বলেছিল, "খোকা, তুমি কোন্ ফ্লোরে উতারবে?" গোগোল বুঝেছিল, লোকটা অবাঙালী। নীচে ওর বন্ধুদের মধ্যে তখন কেবল জর্জ ছিল। তারপরে—

৫

মহেশানিদের ফ্ল্যাটের ঘটনাটা কারোকে বলার জন্য গোগোলের মনটা ছটফট করছিল। সেইজন্যই জর্জের হাত ধরে বাগানের পাশে গিয়ে বসল। প্রথমে ডাবুদাদের ফ্ল্যাট থেকে নেমে আসার সময় বন্ধ ঘরে যে-শব্দ শুনেছিল, গোগোল সে-কথা জর্জকে বলল। তারপরে এখন সাপের মতো হিসিয়ে ওঠা শব্দের কথাও বলল। ড্রাইভারের মতো দেখতে, পায়ে মোটা সোলের স্যাণ্ডেল, ময়লা কালো ট্রাউজার আর সাদা-কালো ডোরাকাটা-জামা-পরা লোকটার কথাও বলতে ভুলল না।

জর্জকে গোগোলের সব কথা বলার অন্য কারণও ছিল। জর্জ অনেক সময় খেলা ভণ্ডুল করে দিয়ে মজা পায়। জম্-জমাটি গল্পের আসর ভেঙে দেয়। সেটা আলাদা কথা। আসলে জর্জের বুদ্ধি অনেক বেশি। গোগোলদের ফ্ল্যাটের পিছনের ছোট ব্যালকনি থেকে, জর্জদের পুরনো তিনতলা বাড়িটা দেখা যায়। জর্জ ওর মা দিদির সঙ্গে তিনতলায় থাকে। জর্জ চিলে কোঠার জানালা খুলে প্রায়ই গোগোলের সঙ্গে হাত নেড়ে ইশারা করে কথা বলে।

গত বছর তো একটা কাণ্ডই ঘটে গিয়েছিল। গোগোল কয়েকদিন অসুখ করে বাড়িতে ছিল, ইস্কুলে যায়নি। এমন কিছু বাড়াবাড়ি অসুখ নয়, সামান্য জ্বর হয়েছিল। ওরকম সামান্য জ্বরে সব সময়ে বিছানায় শুয়ে থাকা যায় না। দুপুরে মা যখন একটু ঘুমিয়ে পড়তেন, গোগোল তখন একটা ছোট আয়না নিয়ে রোদে ধরে, তার আলোর ঝিলিকটা পাঠিয়ে দিত জর্জদের চিলেকোঠার জানালায়। আয়না রোদে ধরে, আলোর ঝিলিক ছুঁড়ে দেবার খেলাটা জর্জই ওকে শিখিয়েছিল। গত বছর ওরা দুপুরে যখন এরকম রোদে আয়না ধরে খেলা করছিল, তখনই সেই ঝিলিক একটা সরকারি অফিস বাড়ির ছাদে পড়েছিল। আর তাতেই হঠাৎ একটা লোককে সেই বাড়ির ছাদে, আয়নার ঝিলিকে চমকিয়ে উঠতে দেখেছিল। আসলে ছাদের আলসের আড়ালে একটা মারামারির ঘটনা ঘটেছিল। তার ফলে একজন মারাও গিয়েছিল। জর্জ আর গোগোলই তার একমাত্র সাক্ষী ছিল।

যাই হোক, সেটা আলাদা একটা ঘটনা। কিন্তু এখন গোগোলের মুখে মহেশানিদের দরজা-বন্ধ ফ্ল্যাটের ভিতরে শব্দের কথা শুনে, জর্জ রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল, "তুই ঠিক শুনেছিস তো?"

গোগোল অধৈর্য হয়ে বলল, "না শুনলে বলব কেন? শুনেছি বলেই তো তোকে বলছি।"

জর্জ জিজ্ঞেস করল, "তুই ঠিক জানিস, মহেশানিদের ঝি-চাকর কেউ রয়েছে কি না?"

গোগোল বলল, "নিশ্চয়ই জানি। ওঁদের তো কাজের লোক একজনই ছিল, তার নাম চান্দা। সেও মহেশানিদের সঙ্গে গাড়ি চেপে চলে গেছে। সে ফ্ল্যাটে থাকলে কি তাকে আমি দেখতে পেতাম না? তুইও দেখতে পেতিস। চান্দা সিংকে তো তুই চিনিস।"

জর্জ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "তা চিনি। চান্দা সিংকে দেখলে বাড়ির চাকর বলে মোটেই চেনা যায় না। লোকটা পিলু আর জ্যাকির থেকেও ভাল ড্রেস করে রাস্তায় বেরোয়। কিন্তু গোগোল, তুই ঠিক জানিস, মহেশানিদের সঙ্গে চান্দা সিংও দিল্লি চলে গেছে? নাকি আন্দাজে বলছিস?"

গোগোল এবার একটু যেন থমকে গেল। চান্দা সিংকে ও মহেশানিদের সঙ্গে এই চত্বরেই, গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে জড়সড় হয়ে বসতে দেখেছিল। তারপরে ও আর চান্দা সিংকে একবারের জন্যও দেখতে পায়নি। সেইজন্য ও ধারণা করেই নিয়েছে, চান্দা সিংও মহেশানিদের সঙ্গে দিল্লি চলে গিয়েছে। গোগোল কিছুটা দমে গিয়ে বলল, "চান্দা সিং দিল্লি চলে গেছে কি না, আমি জানি না। কিন্তু এ ক'দিনের মধ্যে তাকে আমি একবারও দেখতে পাইনি। সে থাকলে কি একবারও দেখতে পেতাম না?"

জর্জ মাথা নেড়ে বলল, "নাও পেতে পারিস। তুই যখন ইস্কুলে যাস, তখন হয়তো সে বেরোয়। এখন গিয়ে দ্যাখ্, সে

হয়তো ফ্ল্যাটের মধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে।"

"বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা!" গোগোল চোখ বড় করে বলল, "চান্দা সিংয়ের আবার বন্ধুবান্ধব কোথায়?"

জর্জ হেসে বলল, "গোগোল, তুই সত্যিই ছেলেমানুষ। এখন তো চান্দা সিংই ফ্ল্যাটের রাজা। কলকাতায় কি তার কোন বন্ধুবান্ধব নেই বলছিস্? তাদেরই ডেকে এনে খালি ফ্ল্যাটে মৌজ করে আড্ডা দিচ্ছে। এখন কোন কাজকর্ম নেই। নিজের খাবার তৈরি করা, আর ফ্ল্যাট পাহারা দেওয়া।"

গোগোল জর্জের কথা বেমালুম উড়িয়ে দিতে পারল না। বাবা মায়ের কথাবার্তায় ও অনেকবারই শুনেছে, আজকাল যা অবস্থা, তাতে ফ্ল্যাট একেবারে খালি রেখে কোথাও যাবার উপায় নেই। গোগোলরা যখন কোথাও বাইরে বেড়াতে যায়, তখন বঙ্কিমদার ওপরেই ফ্ল্যাটের দায়িত্ব থাকে। বঙ্কিমদার বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি না। সে চৌদ্দ-পনর বছর বয়স থেকে গোগোলদের বাড়িতে কাজ করে। বঙ্কিমদা যেমন বিশ্বাসী, তেমনি তার দায়িত্বজ্ঞান। বাবার অফিসের একজন সামান্য কর্মচারীর ছেলে সে। বাবা মা দু'জনেই বঙ্কিমদাকে ভালবাসেন। গোগোলের মতোই বঙ্কিমদাও রোজ বিকালে ছুটি পায়। আর ছুটি পেলেই সে কাছাকাছি তার চেনাশোনা লোকের সঙ্গে গল্প করতে চলে যায়। চান্দা সিং কি তা হলে বঙ্কিমদার মতোই মহেশানিদের ফ্ল্যাট পাহারা দিচ্ছে?

জর্জ বলল, "চল্, তোর মনে যখন সন্দেহ হচ্ছে, রাস্তা থেকে মহেশানিদের ফ্ল্যাটের জানালাগুলো দেখে আসি।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "জানালাগুলো দেখে কী হবে?"

"চান্দা সিং তো আর সব জানালা-দরজা বন্ধ করে ফ্ল্যাটের মধ্যে থাকবে না। জানালা খোলা থাকলেই বোঝা যাবে, চান্দা সিং ভেতরে রয়েছে।" বলতে বলতে জর্জ হেসে ফেলল।

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "হাসছিস যে?"

জর্জ ওর বড় বড় দাঁতে হেসেই বলল, "কোথায় সবাই ডাবুদার হারিয়ে যাওয়া নিয়ে ভাবছে, আর তুই মহেশানিদের ফ্ল্যাট নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস। তোর মাথায় সত্যি পোকা আছে।"

গোগোল গেটের কাছে যেতে-যেতে একবার ওদের ফ্ল্যাটের দিকে মুখ তুলে দেখল। কোন জানালায় মাকে দেখতে না পেয়ে নিশ্চিন্ত হল। মা বারণ করে দিয়েছেন, গোগোল যেন ফ্ল্যাটের চত্বর আর বাগান ছেড়ে কোথাও না যায়। কিন্তু জর্জের কথাই সত্যি। মহেশানিদের ফ্ল্যাট নিয়ে ভাববার কোনো মানেই হয় না। ডাবুদার হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে মহেশানিদের ফ্ল্যাটের কোন ব্যাপারই থাকতে পারে না। আর চান্দা সিং যদি ফ্ল্যাটে থাকে, তাহলে ফ্ল্যাটের ভিতরের শব্দ শুনে গোগোলের পাগলামি করাটা নেহাতই বোকামি।

গোগোল আর জর্জ দুজনেই রাস্তায় গিয়ে মহেশানিদের ফ্ল্যাটের দিকে মুখ তুলে দেখল। দেখা গেল, সব জানালা বন্ধ। এবার জর্জ অবাক হয়ে বলল, "আরে, জানালাগুলো বন্ধ।"

গোগোল জর্জের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা হলে কি তোর মনে হচ্ছে ফ্ল্যাটে কেউ নেই? খালি?"

জর্জ বেশ গম্ভীর হয়ে একটু ভাবল। এখন আর জর্জ মোটেই হাসি-ঠাট্টা করবার ছেলে নয়। বলল, "ফ্ল্যাটটা যদি খালি থাকে, আর তুই যদি ওসব শুনে থাকিস, তাহলে ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে লাগছে না? আচ্ছা, কারোকে জিজ্ঞেস করলে হয় না, চান্দা সিংকে কেউ এর মধ্যে দেখেছে কি না?"

গোগোল বলল, "তার কী দরকার? চল্ না, সিকসথ্ ফ্লোরে গিয়ে, মহেশানিদের কলিং বেলটা টিপে দেখি। চান্দা সিং ভেতরে থাকলে নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে।"

জর্জ বলল, "তুই কেন আগেই বেল বাজিয়ে দেখিসনি?"

গোগোল বলল, "কী করে দেখব? আমার তো সে-কথা মাথায়ই আসেনি। আমি তো ভেবেছি ফ্ল্যাটটা খালি।"

জর্জ বলল, "চল তা হলে সিকসথ ফ্লোরে যাই।"

ওরা দুজনে যখন ফ্ল্যাটের সামনে সিঁড়ি দিয়ে লিফটের কাছে এল, তখন লিফট নীচেই ছিল। ওরা দুজনে লিফটের খাঁচায় ঢুকে, দরজা বন্ধ করল। গোগোল ছ' নম্বর বোতাম টিপল। লিফট দুটো ফ্লোর উঠতে না উঠতেই নীচের থেকে কেউ বোতাম টিপল। তাতে কিছু আসে যায় না। লিফট সিকসথ ফ্লোরে উঠে থামতেই গোগোল আর জর্জ তাড়াতাড়ি নেমে, আবার দুটো দরজাই বন্ধ করে দিল। তৎক্ষণাৎ লিফট নীচে নেমে গেল।

ওপরেও এখন আলো কমে গিয়েছে, সিঁড়ির টিমটিমে আলো জ্বলছে। গোগোল আর জর্জ মহেশানিদের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জর্জ মাথা নেড়ে গোগোলকে কলিং বেল টিপতে ইশারা করল। গোগোল হাত বাড়িয়ে, জোরে সাদা লম্বাটে বোতামটা টিপে দিল। কিন্তু টেপাই সার হল। কোন শব্দই শোনা গেল না। গোগোল আর জর্জ অবাক চোখে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। এবার জর্জ নিজেই বোতামটা জোরে জোরে টিপল। কোনো শব্দই শোনা গেল না।

গোগোল বলল, "আশ্চর্য তো। অথচ মহেশানিদের কলিং বেল বেশ পিয়ানোর জলতরঙ্গের মত বাজে। আমি নিজের কানে শুনেছি।"

জর্জ বলল, "বেলের সুইচটা অফ করে রাখেনি তো?"

গোগোল সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে, মুখ নিচু করে ইয়েল লকের ছিদ্রে উঁকি দিল। দিতেই ওর গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে উঠল। ও স্পষ্ট দেখল, ভিতরে একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। তা হলে ভিতরের পর্দাটা নিশ্চয়ই কেউ সরিয়েছে। তা না হলে ভিতরের আলো দেখা যাবে কেমন করে? এর আগে তো গোগোল নিরেট অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পায়নি। কয়েক সেকেণ্ডের ভাবনার মধ্যেই, গোগোল দেখল ছিদ্রটা হঠাৎ অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। কী করে?

ঠিক এই সময়েই লিফট উঠে আসার শব্দ পেয়ে, গোগোল জর্জের হাত ধরে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে কয়েক ধাপ নেমে গেল।

(ক্রমশ)

ছবি সমীর সরকার

শার্লক হোমস্ আসলে

অশ্রুকুমার সিকদার

অল্পবয়সী শ্রীকান্তের গুরু ছিল ইন্দ্রনাথ। সব রকম দুঃসাহসিক কাজের পাণ্ডা ছিল এই দুর্দান্ত কিশোর। সবাই বলেন, ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারকে দেখেই শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথ চরিত্র রচনা করেছিলেন। অনেকে এতদূর বলেন যে, শ্রীকান্ত আসলে শরৎচন্দ্র নিজেই। সেই রকম বিভূতিভূষণের অপুও অনেকটাই বিভূতিভূষণ নিজেই। আলেক-জান্ডার শেলকার্ক বলে একজন সত্যিকারের নাবিকের কাহিনী নিয়ে ড্যানিয়েল ডিফো লিখেছিলেন, রবিনসন ক্রুশোর গল্প। সাহিত্যিকেরা বেশির ভাগ সময় এই রকমভাবে নিজেকে বা নিজের চেনাশোনা মানুষকে নিজেদের রচনার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। অবশ্য আসলে মানুষটি যেমন, সাহিত্যের মধ্যে হুবহু তেমনটি থাকে না। লেখক খানিকটা কল্পনা দিয়ে অদলবদল করে নেন অথবা চেনা দুটো মানুষের চেহারা, কথাবার্তা, আচারব্যবহার মিলিয়ে অনেক সময় তৃতীয় একটা মানুষ তৈরি করেন। ঘোড়াও বাস্তবিক আছে, পাখিও আছে—এই দুই মিলিয়ে যেমন তৈরি হয়েছে রূপকথার পক্ষিরাজ ঘোড়া। অথবা বক আর কচ্ছপ এবং হাঁস আর সজারু মিলিয়ে সুকুমার রায়ের যেমন বকচ্ছপ বা হাঁসজারু। লেখকদের কল্পনার, সুকুমার রায়ের মতো উদ্ভট কল্পনার পিছনেও এই রকম বাস্তবের ভিত্তি থাকে।

আজ বলছি বিশ্বসাহিত্যের এক বিখ্যাত গোয়েন্দা-চরিত্রের কথা। গোয়েন্দা-চরিত্র তো তোমাদের খুব পছন্দ! অনেকেই গোয়েন্দা-গল্প পড়, আর ভাব, বড় হয়ে গোয়েন্দা হবে। সত্য ঢাকা দেওয়ার নানান কৌশল সত্ত্বেও ফাঁক করে দেবে শয়তান অপরাধীর সব জারিজুরি। ফেলুদা তো তোমাদের অনেকের নিত্যসংগী। বাংলা ভাষায় আর-একজন বিখ্যাত গোয়েন্দার গল্প লিখেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই গোয়েন্দার নাম ব্যোম-কেশ বক্সী। আমি কিন্তু বলছি, দেশী গোয়েন্দা নয়, বিদেশী গোয়েন্দা-গল্পের নায়কের কথা। নাম তার শার্লক হোমস্—ইংরেজি গোয়েন্দা-গল্পের সবচেয়ে নামজাদা নায়ক। যিনি সৃষ্টি করেছেন এই চরিত্র, সেই লেখকের নাম আর্থার কোনান ডয়েল। অবশ্য শার্লক হোমস্ বা কোনান ডয়েলের কথা আজ বলছি না; বলছি, যে সত্যিকারের মানুষটিকে অবলম্বন করে কোনান ডয়েল বিখ্যাত শার্লক হোমস চরিত্রটিকে রচনা করেছিলেন, সেই অদ্ভুত মানুষটির কথা।

স্কটল্যান্ডের এডিনবরা শহরের বিখ্যাত চিকিৎসক এবং সেখানকার মেডিক্যাল কলেজের একজন নামী অধ্যাপক ডাক্তার জোসেফ বেল ছিলেন আসল শার্লক হোমস্। কোনান ডয়েল নিজে ছিলেন এই ডাক্তার বেলের একজন ছাত্র। ১৮৮১ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করে কোনান ডয়েল ভেবেছিলেন তিনি ডাক্তারি করবেন। ছ বছর দোকান সাজিয়ে বসেও যখন পশার জমল না, তখন ভাবলেন গোয়েন্দা-গল্প লিখেই সংসার চালাবেন। কোনান ডয়েল আত্ম-জীবনীতে লিখেছেন, গোয়েন্দা-চরিত্র আঁকতে গিয়ে মনে পড়ে গেল ঈগলের-মত-ধারালো-মুখশ্রীসম্পন্ন তাঁর প্রাক্তন মাস্টার-মশাই ডাক্তার বেলের কথা। বেলসাহেবের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি কোনান ডয়েলের মনে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল যে, শার্লক হোমস্ চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে রক্তে-মাংসে বাস্তব তাঁর শিক্ষকের আদলেই তাকে গড়েছিলেন। কোনান ডয়েল সে কথা অনেকবার স্বীকার করেছেন। এমন কী, বেলসাহেবকে লেখা চিঠিতেও স্বীকার করেছেন। ডাক্তার বেল তাঁর নিজের জীবনে

যে-সব আশ্চর্য-আশ্চর্য পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তার বেশ কয়েকটি কাহিনী সামান্য অদলবদল করে কোনান ডয়েল নিজের রচনায় ব্যবহার করেছেন। বেলসাহেবের বুদ্ধি ধার নিয়ে তিনি প্রমাণ দিতেন তাঁর গোয়েন্দা-নায়ক শার্লক হোমসের বুদ্ধিমত্তার। অবশ্য তার জন্যে তিনি মাস্টারমশাইয়ের অনুমতি

নিতেন। আর একজন লেখক রবার্ট লুই স্টিভেনসন, যিনি 'ট্রেজার আইল্যান্ড' বলে চমৎকার বইটা লিখেছিলেন, তিনি বেল-সাহেব ও কোনান ডয়েল দুজনকেই খুব ভালভাবে চিনতেন। কোনান ডয়েলের গল্পগুলো পড়তে পড়তে তাঁর সন্দেহ হয়, শার্লক হোমসের কথাগুলো যেন বেলসাহেবের কথাই। স্টিভেন-সনের প্রশ্নের জবাবে কোনান ডয়েল জানান, ঠিকই ধরেছেন স্টিভেনসন। বেলসাহেবই আসলে শার্লক হোমস্। একবার বেলসাহেব বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে কথাপ্রসঙ্গে তাঁর পর্যবেক্ষণক্ষমতার একটা গল্প বলছিলেন। ততদিনে পাঠক-দের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে শার্লক হোমস্ চরিত্র। বেলসাহেবের পর্যবেক্ষণক্ষমতার গল্পটি শুনে একজন শ্রোতা মুগ্ধ বিস্ময়ে মন্তব্য করলেন, "আপনি যে দেখি শার্লক হোমস্ হয়ে গেলেন।" বেলসাহেব শান্তভাবে জবাব দিলেন, "আমিই তো শার্লক হোমস্।" ভদ্রলোক হয়তো এটাকে বাড়াবাড়ি ভেবেছিলেন, কিন্তু ডাক্তার বেল এতটুকুও বাড়িয়ে বলেননি।

অথচ বাইরের দিক থেকে গল্পের নায়ক শার্লক হোমস্ ও তার আদর্শ জোসেফ বেলের মধ্যে কতই তফাত! ২২১বি, বেকার স্ট্রীটের বাসিন্দা শার্লক হোমস্ বুদ্ধিসর্বস্ব মানুষ, থাকত একা একা। সঙ্গী বলতে ছিল ডাক্তার ওয়াটসন। কিন্তু ডাক্তার বেল ছিলেন হৃদয়বান সামাজিক মানুষ; তাঁর ছেলেমেয়ে ছিল, ছিল কত অনুরাগী বন্ধু ও ভক্ত ছাত্র। ডাক্তার বেল হোমসের মতো কাপড়ের টুপি বা হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো কোট পরতেন না, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখার জন্যে আতস কাঁচও ব্যবহার করতেন না। তীক্ষ্ণ ধূসর চোখ ছিল ডাক্তার বেলের, হাঁটতেন হঠাৎ-হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে। কোনান ডয়েলের বর্ণনা অনুযায়ী শার্লক হোমস ছিলেন বেশ লম্বা, হাঁটতেন খানিকটা ঝুঁকে। কিন্তু এইসব অদরকারী অমিলে কিছু আসে-যায় না। হোমসের সঙ্গে বেলসাহেবের মিল ছিল অনেক গভীরে। তা ছাড়া কিছুটা অমিল লেখকেরা অনেক সময় ইচ্ছে করে করেন, যাতে চরিত্রের পিছনে আসল মানুষটাকে পাঠকেরা চট করে চিনতে না পারে। গোয়েন্দা শার্লক হোমসের সঙ্গে বেলসাহেবের কোথায় ছিল সেই গভীর মিল? দুজনেরই ছিল খুঁটিয়ে দেখার তীক্ষ্ণ নজর, যা দেখছেন তাকে বিশ্লেষণের ক্ষমতা, আর বিশ্লেষণ করে যে-মানুষটিকে দেখছেন তার অতীত-বর্তমানকে জেনে নেবার দক্ষতা। সব মানুষেরই তো বাইরের চেহারা মোটামুটি এক—সকলেরই একটা নাক, দুটো কান, একটা মাথা আর দুটো-দুটো করে হাত-পা আছে। কিন্তু ছোট-ছোট তুচ্ছ ব্যাপারে মানুষ আলাদা—শরীরে, পোশাকে, ব্যবহারে। বই বাঁধায় যে দপ্তরী, তার বসার ভঙ্গি, আর যে জুতো সেলাই করে তার বসার ভঙ্গি আলাদা। সৈনিক নাবিক আর পুলিসের হাঁটার ভঙ্গি আলাদা। কাঠমিস্ত্রির হাতে যেখানে কড়া পড়ে, রাজমিস্ত্রির হাতে সেখানে পড়ে না। প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষের ভাষার সূক্ষ্ম পার্থক্য শিক্ষিত কানে ধরা পড়ে যায়। এই সব আপাতদৃষ্টিতে যা তুচ্ছ তার প্রতি নজর দিয়ে মানুষের চরিত্র বিচারের ক্ষমতাই পর্যবেক্ষণক্ষমতা। আসল ডাক্তার বেলের কাছ থেকেই কোনান ডয়েলের কাল্পনিক শার্লক হোমস সেই পর্যবেক্ষণক্ষমতা পেয়েছিল। হোমস তাঁর কথা ধার করেই বলত, মানুষকে চিনতে হলে নজর দিতে হবে তার নখের দিকে, তার জামার আস্তিন, বোতাম, জুতো এইসবের দিকে। হোমসও জানত যাকে আমরা তুচ্ছ ব্যাপার মনে করি, তারই মহিমা অপার। সেই সব তুচ্ছ খুঁটিনাটির দিকে নজর দিয়েই অপরাধীকে সনাক্ত করা যায়। ডাক্তার বেল এডিনবরার ডাক্তারখানায় বসে একেবারে অপরিচিত মানুষের জাতিপরিচয়,

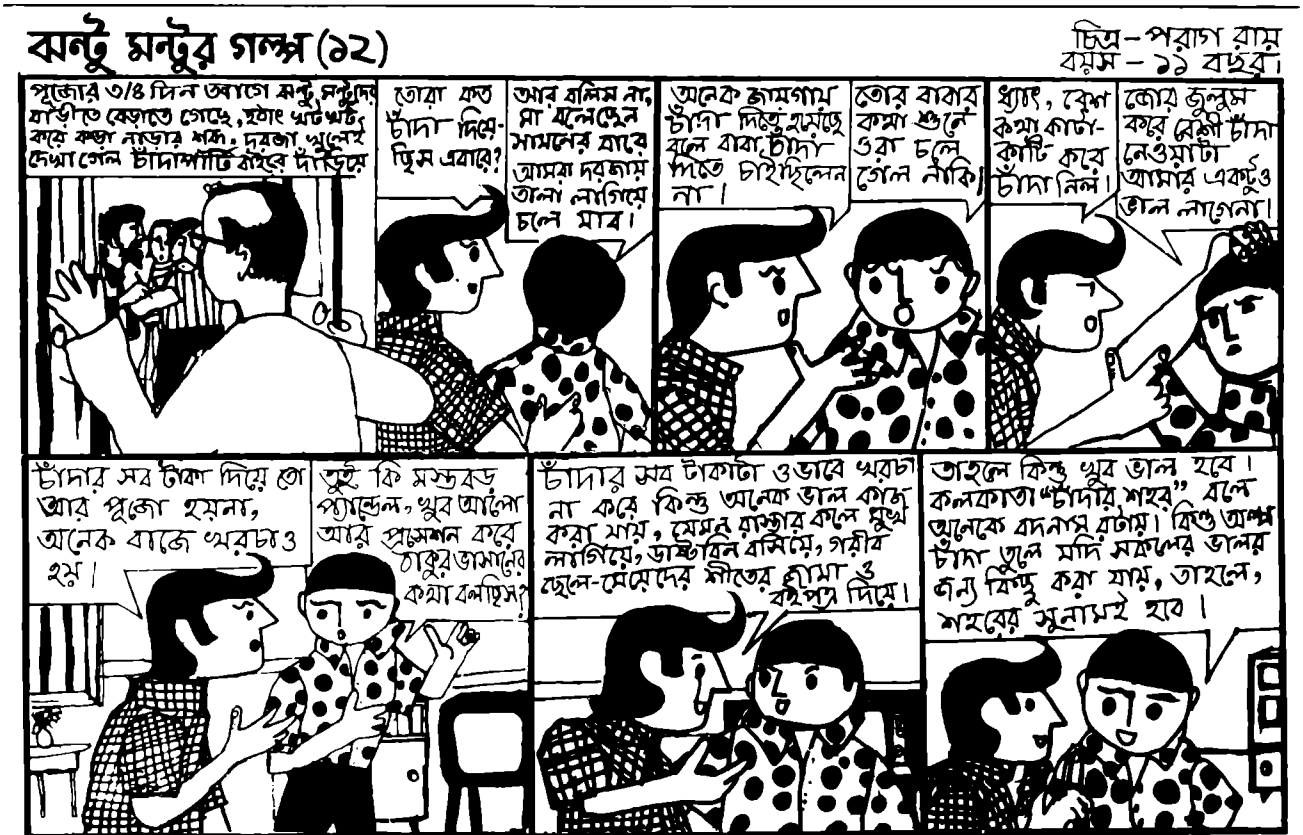

এই শহরটা বন্টু-মন্টুর মত তোমারও। এই শহরটার ভাল মানে তোমারও ভাল,—ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি.এম.ডি.এ)

'সুতানুটি গেজেট' (বাংলা), 'ক্যালকাটা পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার' (ইংরাজী) প্রতিটির দাম এক টাকা। নগদে বা মনিঅর্ডারে সি.এম.ডি.এর অফিস ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ তে পাওয়া যাচ্ছে।

পেশা, অভ্যাস, জীবন-ইতিহাস অবলীলায় বলে দিতেন। পর্যবেক্ষণক্ষমতার পরীক্ষা দেওয়া ছিল তাঁর দৈনন্দিন খেলা। তিনি যখন সপরিবারে রেলগাড়ি করে কোথাও যেতেন, তখন এই খেলায় ছেলেমেয়েদের মাতিয়ে রাখতেন। অন্য যাত্রীরা কে কোথায় যাবে, কে কী করে, কী তাদের খেয়াল,, সব ডাক্তার বেল তাদের সঙ্গে বিনা আলাপেই বলে দিতেন। পরে যাত্রীদের কাছ থেকে ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞাসা করে দেখত, তাদের বাবার সিদ্ধান্ত একেবারে নির্ভুল। তারা ভাবত, তাদের বাবা বুঝি বা জাদুই জানেন!

ডাক্তার বেল বলতেন, ডাক্তার এবং গোয়েন্দার এই পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি দরকার। ডাক্তারের রোগনির্ণয়ে সাহায্য হয় এই ক্ষমতার জোরে। এই ক্ষমতা ছাড়া গোয়েন্দার পক্ষে অপরাধী খুঁজে বের করা অসম্ভব। বেলসাহেব পেশায় ছিলেন ডাক্তার, আর নেশায় ছিলেন গোয়েন্দা। তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক সার হেনরী লিটলজনের সহযোগিতায় তিনি এডিনবরার পুলিসকে একটার পর একটা অপরাধের সুরাহা করতে ও অপরাধীকে সনাক্ত করতে সাহায্য করেছেন। সে-সব ঘটনা খুব রোমাঞ্চকর। তার মধ্যে একটার কথা বলছি। ইউজেন সাঁপ্রিয়ে বলে প্যারিসের এক ডাক্তারি-ছাত্র এডিনবরায় এসে এলিজাবেথ ডায়ার বলে একটি মেয়েকে বিয়ে করে। একদিন দাসী এলিজাবেথকে তার শোবার ঘরে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পায়। ডাক্তার এলে ইউজেন বলে ঘরের বাতাসের গন্ধ থেকে মনে হচ্ছে গ্যাস লিক্ করায় তার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অসুস্থ এলিজাবেথ হাসপাতালে মারা যায়। খোঁজ করে দেখা গেল দেয়ালের ভিতরের গ্যাসের পাইপ ঠিকই ফাটা। সন্দেহ করা হয়, ইউজেন নিজেই স্ত্রীর মৃত্যুকে স্বাভাবিক প্রমাণ করানোর জন্যে গ্যাসের পাইপ ফাটিয়ে রেখেছে। ইউজেন উত্তরে বলে, সে কী করে জানবে যে, দেয়ালের ভিতরে পাইপ আছে। আর ইতিমধ্যে পুলিসের ডাকে বেলসাহেব ও অধ্যাপক লিটলজন ঘর তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে রোগিণীর বালিশে খুব ছোট ছোট বমির চিহ্ন পেলেন। এদিকে দাসী বলল, প্রথমে ঘরে ঢুকে সে গ্যাসের গন্ধ পায়নি, দ্বিতীয়বার পেয়েছিল। ডাক্তার বেল খুঁজে খুঁজে একজন গ্যাস-মেকানিককে বের করলেন, যার কথা থেকে জানা গেল, বছরখানেক আগে ইউজেন মেকানিককে দিয়ে ঘরের গ্যাস পাইপটি সারিয়ে নিয়েছিল। আর মেকানিক যতক্ষণ সারাচ্ছিল, ততক্ষণ ইউজেন কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখছিল। প্রমাণ হয়ে গেল ইউজেন গ্যাস পাইপের খবর জানত। দাসী ঘর থেকে প্রথমবার বেরোলে তার পক্ষে গ্যাস পাইপ ফাটানো সম্ভব, যাতে প্রমাণ করা যায় গ্যাসের ক্রিয়ায় এলিজাবেথের মৃত্যু হয়েছে। এলিজাবেথের বমির রাসায়নিক পরীক্ষা করে যে আফিং বিষের প্রমাণ পাওয়া গেল, সেই আফিং পাওয়া গেল এলিজাবেথের খাদ্যনালীতে। বেলসাহেব খুঁজে বের করলেন এডিনবরার সেই দোকানদারকে যে ইউজেনকে আফিং বেচেছিল। এই সব প্রমাণ পুলিসের হাতে তুলে দিলেন ডাক্তার বেল ও তাঁর সহযোগী লিটলজন। আর পুলিস সেই সব উপস্থিত করল আদালতে। ইউজেন সহজেই দোষী সাব্যস্ত হল, বিচারক তার ফাঁসির আদেশ দিলেন। ফাঁসির সময় মঞ্চে উঠল ইউজেন খুব সাজগোজ করে, মুখে তার দামি চুরুট। ফাঁসির সময় হাজির হলেন লিটলজন। তার দিকে তাকিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী ইউজেন বলল, "সাবাস লিটলজন! তোমার বন্ধু বেলকেও সাবাস! তোমাদের জন্যেই আমি ধরা পড়লাম।"

তাই পেশায় ডাক্তার আর শখে গোয়েন্দা বেলসাহেব বলতেই পারেন—"শার্লক হোমস আসলে আমিই।"

ছবি সুনীল শীল

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার

মণিমেলা মহাকেন্দ্রের নিয়মিত শাখাকেন্দ্রগুলি ১৫ আগস্ট ভারতের ৩১তম স্বাধীনতা দিবস এবং ঋষি অরবিন্দের জন্মোৎসব যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করে। ৯ আগস্ট সশ্রদ্ধচিত্তে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বীর সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় মণিভাইবোনেরা। ১২ আগস্ট প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ হরিনাথ দের জন্মশতবার্ষিকী শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। ২৮ আগস্ট ঘরোয়া পরিবেশে মণিভাইবোনেরা রাখীবন্ধন উৎসব উদ্‌যাপন করে।

২৮ আগস্ট গেয়াবাগান রানীভবানী বিদ্যালয়ে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে আন্তঃমণিমেলা সমবেত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফলাফল : ক বিভাগ—প্রথম, ইউনিক পার্ক ও দক্ষিণপল্লী; দ্বিতীয়, বিজয়গড়, তৃতীয় যাদবপুর কলোনি। খ বিভাগ—প্রথম, বিজয়গড়, ও অরণি; দ্বিতীয় ইউনিক পার্ক; গ বিভাগ—প্রথম, অরণি ও ইউনিক পার্ক।

আঞ্চলিক সংবাদ

২১ আগস্ট কল্যাণী কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফলাফল : প্রথম—অনিন্দিতা, দ্বিতীয়—অনামিকা। শ্রেষ্ঠ আদেশদানকারী—অনিন্দিতা মণিমেলার শ্রীইন্দনীল মাইতি। ২১ আগস্ট আসানসোল—বার্নপুর অঞ্চলের কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফলাফল : প্রথম, আনন্দ দ্বিতীয়, সুকান্ত, তৃতীয়, সোনার তরী, চতুর্থ রেলপার। শ্রেষ্ঠ আদেশদানকারী—আনন্দ মণিমেলার নিবেদিতা বসু।

মণি-সন্দেশ

কলকাতার কসবা মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়াপ্রদর্শনী ১৯ জুন চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে পালিত হয়। গার্ডেনরিচের আদর্শ মণিমেলা শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে এক ক্রীড়া-শিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করছিল। ২৪ পরগনার আতপুর বৈশাখী মণিমেলা সম্প্রতি নবমিতালী ও নবাঙ্কুর মণিমেলার বিরুদ্ধে দুটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলে উভয় খেলাতেই ৩—১ গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করে। স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে বেহালার ইউনিক পার্ক মণিমেলা আয়োজিত শারীর শিক্ষণ শিবির সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। ১৫ আগস্ট বিরাটির পল্লী মণিমেলার শীল্ড ফাইন্যাল খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। গার্ডেনরিচের আদর্শ মণিমেলা স্থানীয় এক শারীর ক্রীড়া প্রদর্শনীতে বিশেষ সুনাম অর্জন করে।

কলকাতার ইণ্টালী মণিমেলার সাংস্কৃতিক কার্যক্রম উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের ঋতুসঙ্গীত অবলম্বনে একটি সুন্দর গীতি আলেখ্য পরিবেষিত হয়। কলকাতার বৈজয়ন্তী মণিমেলার বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ৫ জুন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর শ্যামচকের বিদ্যাসাগর মণিমেলার চতুর্থ বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। নদীয়ার কৃষ্ণনগর মণিমেলা সম্প্রতি এক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে নজরুল, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেষণ করে। বারুইপুরের আজাদ হিন্দ মণিমেলা পরিচালিত বারুইপুর ব্লক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সমূহের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্প্রতি সুসম্পন্ন হয়।

২৪ পরগনার রু স্টার মণিমেলায় সম্প্রতি দুঃস্থদের জন্য এক দুগ্ধ বিতরণ প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে। বিরাটির পল্লী মণিমেলা স্থানীয় একটি রাস্তার ৩০০ ফুট রাবিশ ঢেলে দেড় ফুট উঁচু করে দিয়ে লোক চলাচলের সুবিধা করে দেয়। সম্প্রতি এক সুন্দর অনষ্ঠানের মাধ্যমে গড়িফার প্রগতি মণিমেলার শুভ উদ্বোধন হয়। ২৪ পরগনার বজবজ মণিমেলার ভাইবোনেরা সম্প্রতি এক শিক্ষাভ্রমণে কলকাতার জাদুঘর, জওহর শিশুভবন ইত্যাদি জায়গা ঘুরে এল। যাদবপুর কলোনি মণিমেলার ভাইবোনেরা সম্প্রতি খুব আনন্দের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় বেড়িয়ে এসেছে। ২৪ পরগনার আতপুর বৈশাখী মণিমেলা নিজেদের তহবিলের উন্নতিকল্পে এক লটারির আয়োজন করেছিল। ২৪ পরগনার ঋষি বঙ্কিম মণিমেলা সম্প্রতি কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসে।

আই এফ এ শীল্ডের কথা ও কাহিনী

মুকুল দত্ত

এ লেখা যখন তোমাদের হাতে পড়বে তখন আই এফ এ শীল্ডের খেলা শেষ হয়ে যাবে। এই খেলাকে বলা হত "ব্লু রিবণ্ড অব ইণ্ডিয়ান ফুটবল।

ব্লু রিবণ্ড হচ্ছে মহাসম্মানের চিহ্ন। ওই 'ব্লু' কথাটি থেকেই এসেছে "ইউনিভার্সিটি ব্লু"। খেলাধুলোয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করলে সম্মানের চিহ্ন হিসাবে যে তকমা দেওয়া হয় তাকে বলে 'ব্লু'। যে কোনো ক্ষেত্রে মহামর্যাদা বোঝাতে বলা হয় "ব্লু রিবণ্ড"।

সত্যিই এক সময় আই এফ এ শীল্ডের খেলা ছিল মহা-মর্যাদার খেলা। এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাওয়াও ছিল সম্মানের ব্যাপার। ভারতের সব কেন্দ্র থেকে যেমন খেলতে আসত সব জাঁদরেল দল, তেমন খেলাও হত দেখার মত।

অবশ্য আগে ব্রিটিশ মিলিটারি দলগুলিই ছিল দারুণ শক্তি-শালী। স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকরা তো সব শহরে তাদের দেশের সৈন্যদের ছড়িয়ে রেখেছিল। গ্রেট ব্রিটেনের বহু স্থানের নাম অনুযায়ী এই সব গোরা পল্টনী বাহিনী দেশ জুড়ে ছিল। রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস, রয়্যাল ওয়েলস ফুসি-লিয়ার্স, শ্লস্টারশায়ার রেজিমেণ্ট, সাউথ ল্যাংকাশায়ার, নর্থ স্ট্যাফোর্ডশায়ার, ব্ল্যাক ওয়াচ, কিংস ওন রাইফেলস, গর্ডনস হাইল্যান্ডার্স, ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেণ্ট, চেশায়ার রেজিমেণ্ট, ডারহামস লাইট ইনফ্যানট্রি, ব্রেকনশায়ার রেজিমেণ্ট, স্রপশায়ার রেজিমেণ্ট, ৪২ হাইল্যান্ডার্স, শেরউড ফরেস্টার, ব্যারাকপুর আর্টিলারি ইত্যাদি অনেক বাহিনী ছিল। সাধারণত আমাদের পশ্চিম বাংলায় থাকত দুটি বাহিনী। একটি ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লায়, অপরটি ব্যারাকপুরে। দুটি দলই লীগে এবং শীল্ডে খেলত। তবু শীল্ডে খেলতে আসত দিল্লী, দেরাদুন, সিমলা, লখনউ, অমৃতসর, রাওয়ালপিণ্ডি, লুধিয়ানা ইত্যাদি জায়গার সব গোরা দল। প্রায় সমস্ত রেজিমেণ্ট বা ব্রিগেডের ফুটবল দলই ছিল দারুণ শক্তিশালী। যেমন ছিল গোরা খেলোয়াড়দের দশাসই চেহারা, তেমন ছিল তাদের শটের জোর ও খেলার কায়দা। ব্রিটিশ শাসনকালের অনেক স্মৃতিই তো আমাদের মন থেকে মুছে যাচ্ছে, কিন্তু যাঁরা ব্রিটিশ সামরিক দলগুলির ফুটবল খেলা দেখেছেন, ওদের খেলার কথায় তাঁদের মনে আজও সুখস্মৃতির দোলা লাগে। আই এফ এ শীল্ডের প্রথম দিকের খেলায় সামরিক দলগুলির ছিল প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য। আস্তে আস্তে অসামরিক দল—যেমন ক্যালকাটা, ডালহৌসী, কাস্টমস শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সামরিক দলগুলির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে থাকে। তারপর মোহনবাগান, কুমারটুলি, শোভাবাজার, ন্যাশনাল, এরিয়ান প্রভৃতি ভারতীয় দলের সঙ্গে চলে সামরিক ও অসামরিক দলের জোর প্রতিযোগিতা। এখনকার নামী টিম ইস্টবেঙ্গলের সৃষ্টি হয় অনেক পরে। ১৯২১ থেকে দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলতে শুরু করে প্রথম ডিভিশনে আসে ১৯২৫ সালে। এখনকার অপর একটি শক্তিশালী ক্লাব মহমেডান স্পোর্টিং বহু পুরনো ক্লাব হলেও তাদের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় শুরু হয় ১৯৩৪ সালে প্রথম ডিভিশনে আসার পর। আগে মোহনবাগান, ন্যাশনাল, কুমারটুলি, এরিয়ান প্রভৃতি ক্লাবের সঙ্গে সামরিক ও সাহেব দলগুলির খেলায় জলুস ছিল বেশি। ভারতের নানা প্রান্তের নামী দলও আই এফ এ শীল্ডে খেলতে আসত। সুদূর ব্রহ্মদেশ থেকেও একবার খেলতে এসেছিল রেঙ্গুন কাস্টমস। সেটা ছিল ১৯২৯ সাল, আজ থেকে ৪৮ বছর আগের কথা। ফাইনালে হেরে গিয়ে-ছিল সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ন রয়্যাল আলস্টার রাইফেলসের কাছে ০—২ গোলে।

প্রথমদিকে এবং তার পরেও বহুকাল শীল্ডের খেলায় সাগরপারের সাহেবদের আধিপত্য সত্ত্বেও ভারতীয়দের খেলা দেখায় যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। শীল্ড প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বহু-গুণ বেড়ে যায় এবং রমরমা শুরু হয় প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসাবে মোহনবাগান ক্লাব ১৯১১ সালে শীল্ড জয়ের পরে। সে ঘটনা তো আজ ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে গেছে। তবু মোহনবাগান ও ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেণ্ট দলের শীল্ড ফাইনালে কত টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল জানো? মাত্র ৬,৯১৪ টাকার। অবশ্য তখন টিকিটের দাম অনেক কম ছিল।

আই এফ এ শীল্ডের বয়স কত হল? কম নয়, এবার ৮৪ বছর পূর্ণ হল। প্রতিযোগিতা হল কিন্তু ৮৫ তম। এটা অঙ্কের হিসাব। কারণ শীল্ড খেলা প্রথম শুরু হয় ১৮৯৩ সালে। সুতরাং ৯৩ থেকে ধরলে ৭৭ পর্যন্ত ৮৫টি প্রতিযোগিতা হবার কথা। বয়স কিন্তু ৮৪। যে বছর শুরু সে বছরেও খেলা হয়েছে, তাই প্রতিযোগিতার সংখ্যা বেড়ে গেছে, যদিও কলকাতায় দাঙ্গা-

হাঙ্গামার জন্য ১৯৫৬ সালে শীল্ডের খেলা হয়নি। কয়েক বছর অবধি প্রতিযোগিতা অসমাপ্তও থেকে গেছে নানা কারণে।

কীভাবে আই এফ এ শীল্ডের খেলা শুরু হয়েছিল সে এক ইতিহাস। মোটামুটিভাবে বলা যায়, সারা ভারতে ফুটবল খেলার প্রসার এবং আকর্ষণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আই এফ এ শীল্ডের প্রবর্তন এবং ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সৃষ্টি একই বছরে অ্যাসোসিয়েশনের নামেই শীল্ড। ১৮৯৩ সালে, অর্থাৎ প্রথম বছরে খেলাও হয়েছিল দুটি অঞ্চলে—কলকাতায় এবং এলাহাবাদে। কলকাতায় অংশ নিয়েছিল ৯টি দল—চারটি সামরিক ও পাঁচটি অসামরিক। অসামরিক দলের মধ্যে একমাত্র ভারতীয় দল ছিল শোভাবাজার ক্লাব। ভারতীয় ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী, এ বছর যাঁর ব্রোঞ্জ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আই এফ এ অফিসে, তিনি ছিলেন শোভাবাজার ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এলাহাবাদ অঞ্চলের খেলায় যোগ দিয়েছিল চারটি সামরিক দল। শেষ পর্যন্ত এলাহাবাদ অঞ্চলের বিজয়ী রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস ১—০ গোলে কলকাতা অঞ্চলের বিজয়ী পঞ্চম রয়্যাল আর্টিলারিকে হারিয়ে শীল্ডে প্রথম নাম খোদাই করেছিল। ফাইনাল খেলা হয়েছিল কলকাতায়, দুদিন। ১৮৯৩-এর ২ সেপ্টেম্বর প্রথম দিনের ফাইনাল ১—১ গোলে অমীমাংসিত ছিল। চারদিন পরে আবার খেলা হয় এবং জেতে রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস।

আই এফ এ শীল্ড কিন্তু কলকাতার প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা নয়। প্রথম প্রতিযোগিতা ট্রেডস কাপের খেলা—শীল্ড শুরু হওয়ার চার বছর আগে যার শুরু এবং এখন যা জুনিয়র প্রতিযোগিতা। ট্রেডস কাপ কমিটিই একটু অদলবদল হয়ে গড়ে ওঠে আই এফ এ এবং তখন থেকে শুরু হয় শীল্ডের খেলা। শীল্ডটি আনা হয়েছিল বিলেতের এলকিংটন অ্যাণ্ড কোম্পানির কাছ থেকে, তাদের কলকাতার এজেণ্ট ওয়াল্টার লক অ্যাণ্ড কোম্পানি মারফত। তখন তো আমাদের দেশে শীল্ড, কাপ, মেডেল তৈরি হত না।

যে আই এফ এ শীল্ডের এত ঐতিহ্য সেই শীল্ডের খেলার জলুস দিন দিন কমে যাচ্ছে কেন? নামী দলের অভাবে। মুখ্যত দুটি কারণে বাইরের নামী দলগুলি আই এফ এ শীল্ডে আসতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। একটি কারণ—রোভার্স, ডুরাণ্ড, ডি সি এম. বরদলুই কমিটি নামী দলকে খরচ-খরচা বাবদ যেমন টাকা দেয় আই এফ এ তা দিতে পারে না। অপর কারণ—এখন খেলা হয় বর্ষার ভিজে মাঠে। বাইরের দলগুলি এ-মাঠে ভাল খেলতেও পারে না। তাই বুরিবণ্ডের রঙ এখন অনেক ফিকে।

আগের সামরিক দল বাদে এক বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান কালচার লীগ দল ছাড়া বাইরের কোনো দলই কলকাতা থেকে আই এফ এ শীল্ড জয় করে নিয়ে যেতে পারেনি। এ এক বৈশিষ্ট্য। ১৯৫৩ সালে ইণ্ডিয়ান কালচার লীগ দলও সরাসরি জিতে শীল্ড পায়নি। ১৯৭৭-এর হিসেব বাদ দিয়ে লিখছি—ইস্টবেঙ্গল শীল্ড পেয়েছে ১৫ বার, মোহনবাগান ১০ বার, মহমেডান স্পোর্টিং ৫ বার এবং পুলিস, এরিয়ান্‌, ই বি আর, রাজস্থান ও বি এন আর একবার করে। হিসেবটা হয়তো তোমাদের মুখস্থ আছে। মিলিয়ে নিতে পার।

লীগ জিতল ইস্টবেঙ্গল

পুষ্পেন সরকার

ইস্টবেঙ্গল লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ১৯৭০ সাল থেকে টানা ছ'বার লীগ জয়ের রেকর্ড। গতবছর রানার্স। এ বছর আবার ফিরিয়ে এনেছে হারানো সম্মান।

পরপর আট বছরের মধ্যে সাতবার লীগ জয়ের গৌরব ছিল একমাত্র মহমেডানের। ইস্টবেঙ্গল সে গৌরবের ভাগিদার হল। পনেরো বার লীগ চ্যাম্পিয়নের রেকর্ড ছিল মোহনবাগানের, ইস্টবেঙ্গলও এবার সেই রেকর্ডে পৌঁছল।

এ-ছাড়া ইস্টবেঙ্গল এমন একটি রেকর্ড করেছে যা ৮০ বছরের লীগের ইতিহাসে অন্য কেউ করতে পারেনি। ১৮৯৮ সালে প্রথম ডিভিশন লীগ শুরু। তিনটি সৈনিক দল—রয়াল আইরিশ রাইফেলস (১৯০১), গর্ডন্স এল আই (১৯০৮) এবং ব্ল্যাক ওয়াচ (১৯১২) সব খেলায় জয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ন হবার কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। ১৯৭৫ সালে একমাত্র ভারতীয় দল হিসাবে ইস্টবেঙ্গল ওই গৌরবের অধিকারী হয়। এ বছর আবার লীগে কোন পয়েণ্ট না হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। সব খেলায় জয়ী হয়ে দুবার চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব প্রথম লাভ করল ইস্টবেঙ্গল। লীগের ইতিহাসে ক্লাবের অনেক সাফল্যের মাঝে এই কৃতিত্ব সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

প্রথম ডিভিশন লীগ খেলার ইতিহাস নাড়াচাড়া করলে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হিসাবে সৈনিক দলগুলির প্রাধান্যই চোখে পড়বে। অবশ্য ক্যালকাটা ক্লাব ও ডালহৌসি ক্লাব মাঝে মাঝে সৈনিক দলগুলিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ভারতীয় দল হিসাবে ১৯৩৪ সালে প্রথম লীগ জয় করে মহমেডান স্পোরটিং আলোড়ন তোলে। তারপর বেশ কয়েকবছর মহমেডানের জয়জয়কার। ১৯৩৯ সালে মোহনবাগানের এবং ১৯৪২ সালে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম লীগ জয়। এরপর থেকে লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রধান ভাগিদার ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। লীগে মহামেডানের শেষ সাফল্য ১৯৬৭ সালে।

এ বছর ইস্টবেঙ্গলের পাঁচজন অভিজ্ঞ ও নামী খেলোয়াড় অন্য দলে যোগ দিয়েছেন। ফলে অধিকাংশ তরুণদের নিয়ে দল গড়তে হয়। লীগের প্রথম চারটি খেলায় ইস্টবেঙ্গল তিনটি গোল খাওয়ার পরে দলের রক্ষণভাগের দুর্বলতা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। কোচ অমল দত্তের সামনে বিরাট সমস্যা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে অনবরত।

অবশেষে ৯ জুলাই সেই মহারণ। ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে লীগ জয়ের ভিত শক্ত করে গড়ে ফেলে। তারপর প্রত্যেকটি খেলোয়াড় অনুপ্রাণিত হয়ে দলের জয়যাত্রার পথ তৈরি করে দেয়। অবশিষ্ট খেলাগুলিতে আর একটি মাত্র গোল খেতে হয় ইস্টবেঙ্গলকে।

এবারে ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যে তরুণদের অবদান ছিল বেশি। দক্ষতায় তরুণদের কিছু ঘাটতি থাকলেও শারীরিক ক্ষমতা, সহনশীলতা, গতি এবং অফুরন্ত উদ্যম ও সাহস নিয়ে তরুণরাই দলের সম্মান আনতে বিশেষ সাহায্য করেছে। গোলে ভাস্কর গাঙ্গুলী, ব্যাকে চিন্ময় চ্যাটার্জী ও শ্যামল গাঙ্গুলী। হাফব্যাকে প্রশান্ত ব্যানার্জী এবং পুরোভাগে মিহির বসু সারা মরশুমই ভাল খেলেছেন। অভিজ্ঞ হাফব্যাক সমরেশ চৌধুরী সম্বন্ধে একটি কথা না বললে অন্যায় করা হবে। গত আটবছর সমরেশ যখনই যে দলের জামা গায়ে পরেছেন সেই দলই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। লীগ খেলার ইতিহাসে এই কৃতিত্ব অন্য কোন খেলোয়াড়ের নেই।

ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের ধারালো অস্ত্র দুই উইং ফরোয়ার্ড সুরজিৎ সেনগুপ্ত ও উলগানাথন। ভারতে এই দু'জনের জুড়ি নেই। পায়ের সূক্ষ্ম কাজে সুরজিৎ সেরা। মোহনবাগান কোচ প্রদীপ ব্যানার্জীর অভিমত : গত চার পাঁচ বছরের মধ্যে সুরজিতের মত ফরোয়ার্ড কলকাতার মাঠে আসেনি। অমল দত্তর গর্ব সুরজিতকে নিয়ে। শত্রুপক্ষের রক্ষণভাগ ভাঙার কৌশল উলগার খুব ভাল করে জানা। তীব্র গতির মধ্যে বল আয়ত্তে রাখার কৌশলে ও দক্ষ।

ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যের আর একটি চাবিকাঠি—দলের নিয়মানুবর্তিতা। কোচ অমল দত্ত, অধিনায়ক শ্যামল ঘোষ এবং সহ-অধিনায়ক সুরজিৎ সেনগুপ্ত দলের খেলোয়াড়দের আচরণ সম্বন্ধে বলেছেন : আমরা এক সুখী পরিবার। আমাদের কোন পরিকল্পনা বা আদেশ সম্বন্ধে কখনও কোন প্রশ্ন তোলেনি কোন খেলোয়াড়। তাই আমরা যখন যেসব আক্রমণ বা রক্ষণের পরিকল্পনা নিয়েছি সেগুলি সার্থক হতে পেরেছে।

প্রতিটি খেলোয়াড়ের রক্ত-জল-করা শ্রমের ফসল। সকলেই নিখাদ সোনা।"

সহ-অধিনায়ক সুরজিৎ মন্তব্য করলেন : "আমার দায়িত্ব আরও বাড়ল। আগামী বছর আমি অধিনায়ক হব। দলের সম্মান উঁচু রাখতে আমাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।"

সব খেলোয়াড়ই তাঁদের মনের আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন নানা কথায়।

ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক ডাঃ নৃপেন দাস আলাদা করে ডেকে নিয়ে আমায় বলেছিলেন : দলের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি জয়ের চাইতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনায় বেশি জোর দিয়েছিলাম। পাঁচ জন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে ছেড়ে দিয়েছিলাম একই কারণে। যে কোনো ক্লাবের পক্ষে এই নিয়ম ও শৃঙ্খলা যে কতবড় সম্পদ আজ সেটা প্রমাণিত হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল থেকে তিন পয়েন্ট পিছিয়ে লীগ রানার্স হয়েছে মোহনবাগান। খেলোয়াড় বিচার করলে মোহনবাগানে নামী

লীগ-বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দল

ফোটো মনোজিৎ চন্দ

লীগে ইস্টবেঙ্গলের শেষ খেলা দুটি ছিল এরিয়ান ও মহামেডানের বিরুদ্ধে। খেলা হয়নি। খেলা জিতে আনন্দ করার মধ্যে একটা আলাদা উত্তেজনা আছে। সে আনন্দ এবার প্রাণভরে উপভোগ করতে পারেননি সদস্য, সমর্থক এবং দর্শকরা। এরিয়ানের খেলার দিনেই মোটামুটি বিজয়-উৎসব পালন করা হয়েছিল। ক্লাব কর্মকর্তাদের বক্তৃতা, অধিনায়কের ক্লাব পতাকা উত্তোলন, খেলোয়াড়দের মাল্যদান, বাজি পোড়ানো—সবই হয় সাদামাটা ভাবে। অন্যানাবারের মতো সারা ময়দান কেঁপে ওঠেনি আনন্দের জোয়ারে।

অনুষ্ঠানের শেষে কোচ অমল দত্তকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কেমন লাগছে আপনার ?"

উত্তরে শ্রীদত্ত বলেছিলেন, "আমার সামনে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ আই এফ এ শীল্ড। সেই চ্যালেঞ্জ কী করে মোকাবিলা করব সেটাই এখন ভাবতে হবে।"

অধিনায়ক শ্যামল ঘোষ বলেন, "আমার এই জয় দলের

খেলোয়াড় অনেক বেশি ছিল। ফুটবল দলীয় খেলা। মিলিত শক্তি সাফল্য আনে। মোহনবাগানের সেই শক্তিতে ঘাটতি ছিল। ইস্টবেঙ্গলের কাছে হারের পরে চ্যাম্পিয়নশিপের আশা অনেক কমে যায়। আগামী বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য নিশ্চয়ই ভুল ত্রুটি শুধরে নেবে মোহনবাগান।

এ বছর লীগে মহমেডান স্পোরটিং ও এরিয়ান এবং তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গড়া জর্জ টেলিগ্রাফ ও চন্দ্র মেমোরিয়াল ভাল খেলেছে। প্রথম পনেরোটি খেলায় অপরাজিত থেকে বি এন আর বেশ সুনাম অর্জন করে। অবশ্য শেষ দিকের সাতটি খেলার মধ্যে পাঁচটিতে হেরে যায়। কাস্টমস মাত্র ১৩ পয়েন্ট পাওয়ায় লীগ তালিকার নীচে। আগামী বছর কাস্টমসকে দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে হবে।

বৃষ্টিতে কয়েকটি খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এ বছর লীগ খেলা শেষ করতে কিছু বাড়তি সময় লাগল। যাই হোক, ১৯৭৭ সালের লীগ মরশুম আনন্দ-দুঃখ সব মিশিয়ে জম-জমাট ছিল।

অস্ট্রেলিয়ার অপ্রত্যাশিত হার

সুব্রত সরকার

গ্রেগ চ্যাপেলের খেলা এদেশে আর দেখা হল না। এখন তাঁর বয়স ২৯। মাস ছয়েক আগে আমাদের কেউ কেউ আশা করেছিল, এই দারুণ ব্যাটসম্যান অস্ট্রেলিয়ান বা অন্য কোনো দলের সঙ্গে একবারটি অন্তত ভারত সফরে আসবেন। তবে বর্তমানে গ্রেগ চ্যাপেল আর টেস্ট ক্রিকেটার নন, তিনি কেরি প্যাকারের দলের খেলোয়াড়। আর কেই বা ভাবতে পেরেছিল যে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে গ্রেগ চ্যাপেলের শেষ সিরিজে তাঁর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া দল অমন শোচনীয়ভাবে ইংলণ্ডের কাছে ৩—০ ম্যাচে হেরে যাবে!

দাদা ইয়ান চ্যাপেল ১৯৬৯ সালে আমাদের এখানে খেলে গিয়েছেন। দুই বছর আগে তিনি যখন অধিনায়কের পদ ছেড়ে দেন, নতুন ক্যাপ্টেন হন গ্রেগ চ্যাপেল। আর তাঁর অধিনায়কত্বের প্রথম সিরিজেই অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ছয় টেস্টের রাবারে ৫—১ ম্যাচে হারিয়ে দেয়। তারপর মাস কয়েকের মধ্যেই ওই একই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইংলণ্ডকে সহজেই ৩—০ ম্যাচে হারায়। ১৯৭৫-৭৬-এর অস্ট্রেলিয়া একাদশে ছিলেন ইয়ান চ্যাপেল ইয়ান রেডপাথ আর ডেনিস লিলির মতন **বাঘা বাঘা** খেলোয়াড়। কিন্তু, গত ইংলিশ মরশুমে অস্ট্রেলিয়ার যে এই অবস্থা হবে খুব কম লোকই ভাবতে পেরেছিল।

অস্ট্রেলিয়া যখন জুলাই মাসের প্রথম দিকে ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে হেরে যায়, তখন দলের সঙ্গে সফরকারী এক সাংবাদিক 'মেলবোর্ন এজ'-এর পিটার ম্যাক-ফারলাইন মন্তব্য করেন ঃ দলের অল্পবয়স্ক খেলোয়াড়দের অনেকেরই ভয় যে, প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাঁরা হয়ত নিজেদের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নষ্ট করে ফেলেছেন। তার ফলে দলের মধ্যে উৎসাহের ভীষণ অভাব ঘটে।

তাঁর কথায় নিশ্চয়ই অনেকটা সত্য ছিল। কারণ, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের বরাবর লড়িয়ে খেলোয়াড় বলে সুনাম। একবার হারার জন্যে অমনভাবে হাল ছেড়ে দেওয়া তাঁদের ক্রিকেট-চরিত্রের বিরুদ্ধে।

এখন ভাবতে কেমন লাগে! লণ্ডনের লর্ডসে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্ট দেখে মনে হয়েছিল কেউ জিততে পারলে—অস্ট্রেলিয়াই জিতবে। আমার সৌভাগ্য, ওই খেলার কিছু অংশ দেখতে পাওয়া ; তাছাড়া দ্বিতীয় টেস্ট টেলিভিশনে 'লাইভ' দেখা। প্রথম খেলা দেখার সময় কিন্তু একবারও মনে হয়নি যে, দুই মাসের মধ্যে ওই তেজী, তরুণ অস্ট্রেলিয়া দলকে পর পর তিনটি খেলায় হারতে দেখা যাবে!

সিরিজের প্রথম দিনে ইংলণ্ডের অবস্থা ছিল ঃ দুই উইকেটে ১১, পাঁচ উইকেটে ১৩৪, নয় উইকেটে ১৮৯। তাদের ২১৬ রানের প্রথম ইনিংসের স্কোর অস্ট্রেলিয়া মাত্র তিনটি উইকেট হারিয়ে অতিক্রম করে। ভাল রান করেন চ্যাপেল, অভিজ্ঞ ডগ ওয়াল্টার্স আর তরুণ ক্রেগ সার্জেন্ট। প্রথম দফায় অস্ট্রেলিয়া ৮০ রানে এগিয়ে থাকার পরে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ডেনিস অ্যামিসকে যখন শূন্য রানে আউট করে, তখন তারা প্রায় নিশ্চিত জয়ের দিকে এগিয়ে। তবে সেটি ছিল চতুর্থ দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের সময়ের ঘটনা। তারপর খেলার মোড় ঘুরল, অস্ট্রেলিয়া সিরিজ (তার সঙ্গে 'অ্যাসেজ') হারার আগে আর ইংল্যাণ্ডকে রুখতে পারল না।

ইংলণ্ডের মাঠে ক্রিকেট খেলা দেখে কতগুলি ছোটখাট জিনিস জানতে পারলাম বা দেখতে পেলাম। যেমন ঃ অস্ট্রে-

লীডসে বয়কটের সেঞ্চুরির পর। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে এটি তাঁর শততম শতরান। ফটো—প্যাট্রিক ইগার

লিয়ার পেস বোলার লেন প্যাস্কো (যিনি লর্ডসে প্রথম টেস্ট খেলায় নামেন) আসলে যুগোস্লাভিয়ার লোক। তাঁর সত্যি-কারের উপাধি ডুর্টানোভিচ, চার বছর আগে এফিডেভিট করে নাম পালটান। গরম বেশি থাকলে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার জেফ টমসন মাঠে নামেন হাফহাতা শার্ট পরে। এটি সত্যিই আশ্চর্য লাগল। ক্রিকেটের ঐতিহ্যগত পোশাক অনুসারে খেলোয়াড়রা সবাই পুরো-হাতা শার্টই পরেন, যদিও তাঁদের অধিকাংশই হাতা গুটিয়ে রাখেন ; টমসন ছাড়া শেষ ৩০ বছরে আর কোনো ক্রিকেটারের কথা জানি না যিনি 'হাফশার্ট' পরে টেস্ট মাঠে নেমেছেন!

আবার দেশে ফিরে ফুটবল—কসমসের হুজুগে আরও 'আবিষ্কার' করলাম—১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে ফুটবল-জাদুকর পেলে ব্রাজিলের এক ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন, সেই একই দিনে ইয়র্কশায়ারের এক ছোট শহরে জন্ম নেন

ব্যাট করছেন অ্যালান নট। স্লিপে ওত পেতে দাঁড়িয়ে আছেন গ্রেগ চ্যাপেল। ফোটো—প্যাট্রিক ইগার

ইংলণ্ডের ওপেনিং ব্যাটসম্যান জেফ বয়কট।

তিন বছর আগে বয়কট নিজের ইচ্ছেতেই ইংলণ্ড দল থেকে সরে যান। অস্ট্রেলিয়া বা ভারত সফর করার ইচ্ছে তাঁর হয়নি। তবে ১৯৭৭-এর মরশুমে তিনি যখন জানান, আমি খেলতে প্রস্তুত, ইংলণ্ডের টেস্ট নির্বাচকরা তাঁকে প্রায় লুফে নেন। আবার টেস্ট প্রাঙ্গণে ফিরে এলেন বয়কট। নটিংহামে অনুষ্ঠিত তৃতীয় টেস্টে তিনি করেন ১০৭ আর ৮০ নট আউট, লীডসে চতুর্থ টেস্টে ১৯১—দুটি খেলাতেই ইংলণ্ড ভালভাবে জেতে। আর বয়কট যেমন বিশেষ এক কারণে ভাল খেলতে প্রায় বাধ্য হন, ইংলণ্ড টিমের তিনজন "প্যাকার প্লেয়ার"ও টেস্ট প্রাঙ্গণ ত্যাগ করার আগে নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শনে আগ্রহী হন। ইংলণ্ড দ্বিতীয় টেস্ট জেতবার মূলে ছিল ডেরেক আণ্ডারউডের ৬০ রানে ছটি উইকেট নেওয়ার ঘটনা; তৃতীয় টেস্টে অ্যালান নট চমৎকার ভাবে ১৩৫ রান করে খেলা ইংলণ্ডের দিকে টেনে নিয়ে যান; আর সিরিজ সমগ্রভাবে দেখলে প্রাক্তন অধিনায়ক টোনি গ্রেগের ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না।

বয়কট, আণ্ডারউড, নট আর গ্রেগ ছাড়া ইংলণ্ডের এই জয়ের অন্য নায়কও ছিল বইকি! প্রথম দুটি টেস্টে বব উল-মারের শতরান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; তাছাড়া ফাস্ট বোলার বব উইলিসের বোলিং—সিরিজের প্রথম ইনিংসে ৭৮ রানে সাত উইকেট নেওয়া থেকে আরম্ভ করে একেবারে শেষ অবধি; মাইক ব্রিয়ারলির নেতৃত্ব আর দায়িত্বপূর্ণ ব্যাটিং; তৃতীয় আর চতুর্থ টেস্টে নবাগত ইয়ান বথামের মিডিয়াম-ফাস্ট বোলিং ইত্যাদি।

অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার যে শুধু লড়িয়ে মনোভাবের অভাব দেখা দিয়েছিল, তা নয়, তাদের ফিল্ডিং—আর যাই হোক না কেন, বরাবরই যেটা তাদের প্রথম শ্রেণীর হত সেটাও বেশ খারাপ হতে থাকে। দ্বিতীয় টেস্ট থেকে আরম্ভ করে অনেক ক্যাচ অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডাররা ফেলে দেন, বিশেষ করে স্লিপ অঞ্চলে। টমসন বেশ ভালই বল করেন; প্যাস্কো বা ম্যাক্স ওয়াকারের পেস বোলিংয়েরও প্রশংসা করতে হয়, তবে টমসন লিলির অভাব নিশ্চয় অনুভূত হয়েছে। সিরিজ হেরে যাওয়ার পরে অস্ট্রেলিয়া আর এক ফাস্ট বোলারকে খেলতে নামায়। প্রথম টেস্ট আবি-র্ভাবে মিক ম্যালান বল ভাল সুইং করিয়ে লণ্ডনের ওভাল মাঠে প্রথম ইনিংসে পাঁচটি উইকেট পান; তবে তখন তো সব কিছু প্রায় চুকে গেছে।

অস্ট্রেলিয়ার পেস বোলিং ভাল হয়েছিল, ফিল্ডিং খারাপ। ব্যাটিংয়ে তিন তরুণ—ডেভিড হুক্স, কিম হিউস্, ক্রেগ সার্জেন্ট কেউই আশানুরূপ ভাল করতে পারেননি। ওয়াল্টার্সেরও প্রায় একই অবস্থা। রিক ম্যাক্কস্কার তৃতীয় টেস্টে করেন ৫১ আর ১০৭; আগে দ্বিতীয় টেস্টে চ্যাপেল অপূর্ব খেলে দ্বিতীয় ইনিংসে ১১২ করেছিলেন। তবে সব মিলিয়ে ইংলণ্ডের ব্যাটিং অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল।

টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়ার অপ্রত্যাশিত পতনের জন্যই এই সিরিজ বিশেষভাবে মনে থাকবে। মনে থাকার আরও একটি কারণ, প্যাকারের ক্রিকেট আরম্ভ হবার আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের এক অধ্যায়ের শেষ হল। শুধু গ্রেগ চ্যাপেল নন, ওই সিরিজে অংশগ্রহণকারী আরও কয়েকজন টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় নিলেন।

ইয়ান বথাম জীবনের প্রথম টেস্টেই পাঁচটি উইকেট নেন। তাঁর বল করবার ভঙ্গি। ফোটো—প্যাট্রিক ইগার

ছানাবড়া / ছানাবড়া / শস্তাওয়ালা ছানাবড়া /
ইস্ / রসে টস্‌টসে ছানাবড়া / কিন্তু পকেট তো গড়েরমাঠ /
ও দোকানী, ছানাবড়ার খেলা দেখাব ? অনেক খদ্দের আসবে!
আরে, আরে, সব খেয়ে ফেলছে /

আঁকো

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

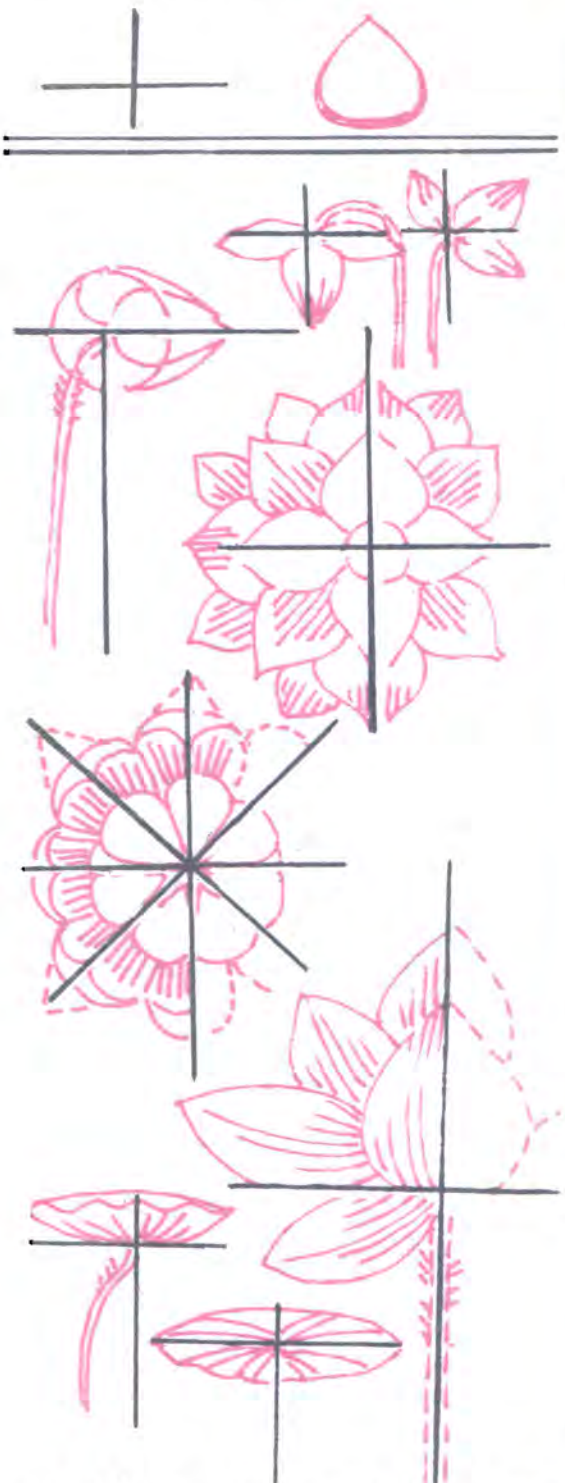

গাছ পাখির সঙ্গে জানো ফুলের মধ্যে পদ্মকে। ওপরের ঐ দুটি আকারের মধ্যেই এক পাপড়ি থেকে হাজারো পাপড়িতে ঘেরা গোটা পদ্মকে যেমন ইচ্ছে তেমনভাবেই পাবে। কেবল নিজের মতো ভেবে আকারকে ছকে ফেল. দেখবে আপনা থেকেই পদ্ম ছবির মত ফুটে উঠছে।

শেখো

কারিগর

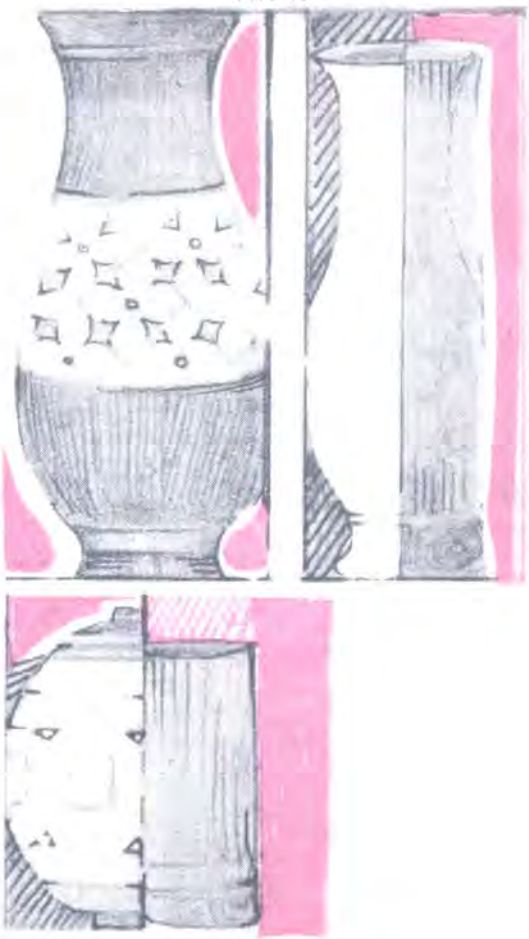

বাঁশের কাজ। ফুলদানি

বাঁশের কাজের জন্য জোগাড় করা জিনিস দিয়েই শুরু করো ফুলদানি, পাউডার কেস এইসব জিনিস। ফুলদানি বা পাউডার কেস তৈরির জন্য বেছে নাও বাঁশের পুরু অংশ গোড়া সমেত। দিন দুই জলে ভিজিয়ে নিজের ভাবা আকারে ছকে বাঁশের গা থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দাও। তারপর তার গা শিরিস কাগজে ঘষেমেজে সমান করে নাও। এবার কোন নক্‌শা করতে চাইলে করে ফেল। তবে রঙ দিয়ে করলে তেল রঙ বা ফেবরিক বা ক্রাইলিন রঙ ব্যবহার করবে। এইভাবে পাউডার কেস ও অন্যান্য ধরনের ফুলদানি অনায়াসে করতে পারো। পাউডার কেসের ঢাকা বাঁশের গিঁট থেকেই হবে। নক্‌শা দিয়ে দেখিয়েছি কীভাবে করবে। আমার দেওয়া নক্‌শা ইচ্ছে-মত করলে দেখবে কোনোটাই খারাপ হচ্ছে না।

জেনে রাখো : (১) ছুরি দিয়ে চাঁছার সময় আঁশ দেখে হাত না চালালে চেঁচে হাতে ফুটবে। (২) সিরিশ-কাগজ ঘষার সময় হাত গোল করে চালাবে। (৩) কাজের শেষে গায়ে তেল মাখিয়ে ধোঁয়ায় রাখতে পারলে গা ভর্তি রঙ পাবে। (৪) ফুলদানির ভেতরে মাপ-মতো প্লাসটিকের গ্লাস বসিয়ে নিলে জল আর মাটিতে ফুলদানির গা নষ্ট হবে না। (৫) ফুলদানির গায়ে কাটা নক্‌শা করার জন্যে নরুন আর ছোট বাটালি জোগাড় করতে হবে।

খুড়ো
অভিযান সফল হোক স্যার এড
ইস্ কত মালা, কত হাততালি পেলো ওরা!
পানসী সাজিয়ে মালা পরিয়ে খুড়িমা খুড়োকে বল্লেন, তুমিও নিশ্চয়ই যেতে পারবে।
সমুদ্র থেকে আকাশ? এ তো আমাকে হামেশাই করতে হয়!
পিসিয়েলের 'খুড়ো'কে পূর্ব রেলওয়ে নতুন করে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।
লোড-শেডিং!
আমরা 'খুড়ো'র চেয়েও এক কাঠি সরেস! রোজই আমরা আপনাদের নিয়ে
সমুদ্র থেকে আকাশে পৌঁছে যাই!
আমাদের কাছে এ আর নতুন কী?
ER462A1/77

কসমসের জার্সি গায়ে পেলে